।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

মধ্যযুগের সমাজে নারী : ইতিহাসে ও তত্ত্বে

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে ১২৭৮ সালের বন্যার ফলে একটি গ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন। ''গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের কর্ত্তব্য, অর্থদানে, খাদ্যদানে প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহা দূরে থাক, খাজনা মাপ করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক, খাজনাটা দুদিন রহিয়া বসিয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়া বসিয়া খাজনা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময় পাইক পিয়াদার সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়া দলবল সহ উপস্থিত হইলেন। ..... একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪৵ আদায় করিতে বসিলেন। ..... আদায় করিয়া লইয়া গেলেন তাহার ৪।৫ দিনের মধ্যেই আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ। আর ৪০ টাকা তুলিয়া দিতে হইবে।''

বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত বিবরণ উপন্যাস নয়, কেননা, তিনি সকল ঘটনা 'ইন্ডিয়ান্ অবজরবর' থেকে গ্রহণ করেছেন। পল্লীগ্রামে এই জাতীয় ঘটনা আজও ঘটছে।

তিনি লিখেছেন — ''জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী''।

এই উদ্ধৃতির প্রয়োজন এইজন্য যে এই জাতীয় ঘটনাই ঘটেছিল বাঙলা-দেশে পাঠান আমলে সামন্ততন্ত্রের শাসনে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনেই' তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে —

''মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্য শাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজাগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে কর সংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা এক প্রকার কর সংগ্রহের কনট্রাক্টর হইলেন। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমীদারের সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি। ....রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য।''

আমাদের আলোচ্য সময় সীমা চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত, কিন্তু এই সময়ের সাহিত্য ও সমাজের রূপ বিশ্লেষণ করতে হলে একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকেই পাঠান সেনা-পতি বখ্‌তিয়ার খিলজীর আক্রমণে বৃদ্ধ রাজা লক্ষণসেনের নদীয়ার সিংহাসন ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে প্রস্থানের পর থেকে বাঙালী কোন প্রকারে আত্মরক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। স্বভাবতই কোন রকম সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা এ যুগের বাঙালীর ছিল না। বখ্‌তিয়ার খিলজীর পর থেকে (১২০৬ খ্রী:অ:) হুসেন

সাহের সিংহাসন লাভ (১৪৯৩ খ্রী:অ:) পর্যন্ত এই পাঠান শাসনের প্রতিকূল পরিবেশকে চিনে নিতে না পারলে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস বা সমাজের রূপ জানা যাবে না। এই যুগকে অনেকেই অন্ধকার যুগ বলেছেন। কিন্তু আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। লক্ষ্য করে যেতে হবে, এই অন্ধকারেও মাঝে মাঝে আলোর শিখা জ্বলে উঠেছে — সাহিত্যের ফসলও ফলেছে। সুতরাং এই যুগকে কোন ভাবেই বন্ধ্যা যুগ বলা চলে না। এই যুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হলো —

ক) খিলজী আমীর-ওমরাহের অধীনে বাঙলা (১২০৬ - ১২২৭ খ্রী:অ:)।

বঙগবিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলজীকে নিহত হতে হয় এক বিশ্বাসঘাতকের হাতে। তারপর থেকে প্রায় বিশ বছর ধরে বাঙলাদেশে চলেছিল খিলজী বংশীয় আমীর ওমরাহ্‌গণের দ্বন্দ্ব কলহ ও বিবাদ বিসম্বাদপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা। বখ্‌তিয়ার খিলজীর হত্যাকারী ইখ্‌তিয়ারকে এই ওমরাহ্‌গণ মানতেন। এঁরা এত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন যে যখন যাকে খুশী গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়েছেন এবং নামিয়েছেন।

খ) দিল্লীর সুলতানদের অধীনে বাঙলা (১২২৭ - ১৩৪১ খ্রী: অ:)।

এরপর শতাধিক বৎসরের জন্য বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত হলো দিল্লীর সুলতানদের আধিপত্য। দিল্লী থেকে তাঁরাই শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠাতেন। সুযোগ পেলে এইসব শাসনকর্তা মাঝে মাঝে দিল্লীর আনুগত্য ত্যাগ

করে স্বাধীন সুলতান হয়ে বসতেন । সুতরাং যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো । এই দীর্ঘ শতাব্দী ধরে দুটি উপশাখার শাসনাধীন ছিল বাঙলাদেশ - মামলুক শাসন (১২২৭ - ১২৮৭ খ্রী:অ:) এবং বলবন শাসন (১২৮৮ - ১৩৪০ খ্রী:অ:)।

গ) **ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধারা (১৩৪২ - ১৪১৩ খ্রী:অ:) ।**

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামসুদ্দিন ইলিয়াসশাহ্ । রাষ্ট্রে ও সমাজে শৃঙখলা স্থাপনের গৌরব এই বংশেরই প্রাপ্য । কিন্তু লোভ লালসা ও ক্ষমতালিপ্সা এই বংশের তৃতীয় পুরুষে এমন রূপ ধারণ করে যে ইলিয়াসশাহের পুত্র সিকান্দারের শেষ জীবনে তাঁর নিজ পুত্রদেরই সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় । ইলিয়াসশাহের অপদার্থ পৌত্রেরা এই বংশের শাসন বলবৎ রাখতে স্বভাবতই বেশিদিন সক্ষম হন নি ।

ঘ) **গণেশ - জালালুদ্দিনের অধীনে বাঙলা (১৪১৪ - ১৪৪১ খ্রী:অ:) ।**

ইলিয়াসশাহী বংশের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । তিনি এক আদর্শ রীতির প্রবর্তন করেছিলেন — দেশের জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী প্রভৃতির সম্মাননার রীতি । গৌড়ের দরবারে দীর্ঘকাল এই রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল । কবি কৃত্তিবাস সম্ভবত এঁর পৃষ্ঠপোষকতাতেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন । রাজা গণেশের পুত্র দ্বিতীয়বার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন নাম নিয়ে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । ইনি অতিশয় উৎপীড়ক ছিলেন । ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে জালালুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর

অপদার্থ পুত্র সায়সুদ্দিন কিছুকাল গৌড়ের সুলতান হয়েছিলেন। অত্যাচার ও নিপীড়নের জন্য বিখ্যাত এই সায়সুদ্দিন ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হলে রাজা গণেশের বংশধারা লুপ্ত হয়।

ঙ) ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারা (১৪৪২ - ১৪৮৭ খ্রী: অ:)।

গণেশ-জালালুদ্দিন বংশের পরে গৌড়ে আবার অরাজকতার অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু এই ধারাতেই বাঙলার সুলতান ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। এঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভাগবতের অনুবাদ করেছিলেন মালাধর বসু — তাঁর গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।

চ) হাবসী শাসন (১৪৮৭ - ১৪৯৩ খ্রী:অ:)।

এরপর হাবসী শাসনে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়, সুখের বিষয় তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তাদের ছয় বছরের শাসন বর্বর অত্যাচার ও বীভৎস উৎপীড়নের শাসন। শেষ শাসক ছিলেন মুজাফর (১৪৮৭ - ১৪৯৩ খ্রী:অ:)। তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাঁধলো আমীর ওমরাহ্ এবং অভিজাত বংশীয়দের। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলো এবং সৈয়দ হুসেন পাইকের সাহায্যে সুলতানকে হত্যা করলেন। এরপর হুসেনশাহ ক্ষমতা গ্রহণ করে (১৪৯৩ খ্রী:অ:) নতুনভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার কাজে উদ্‌যোগী হলেন।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনা থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই হলো বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস।

এখন এই অশান্ত অবস্থায় বাঙালী কি করেছিল তা আলোচনা করা

যেতে পারে ।

বাঙালীর সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলন — তুর্কী আক্রমণের আঘাতে বাঙালী যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল । তবে সংস্কৃত শাস্ত্র অনুশীলন একেবারে থেমে থাকেনি । এই যুগে কোন মৌলিক কাব্য ও নাটকের সন্ধান না পাওয়া গেলেও বাঙালী নিজের ঐতিহ্য ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল । যথার্থ সাহিত্য রচনা শুরু হয় লক্ষণসেনের রাজত্বকালে তাঁর রাজ - সভাকে কেন্দ্র করে । এই সভায় ছিলেন পাঁচজন বিখ্যাত কবি — ধোয়ী , শরণ, উমাপতি, গোবর্ধন এবং জয়দেব । রুকনুদ্দিনের আমলে মালাধর বসু রচনা করেছিলেন —'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য । গণেশের আমলে কবি কৃত্তি - বাস রচনা করেছিলেন 'রামায়ণ'। ত্রয়োদশ শতকে আরও দুটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল —'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং 'কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়'। প্রথমটির সংকলক লক্ষণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস , দ্বিতীয়টির সংকলক কে তা জানা যায় নি । বাঙলা ভাষার উৎপত্তির আগে এবং পরেও বাঙালী সাহিত্য চর্চা করেছে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে । ধোয়ীর 'পবনদূত' এবং গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী' সংস্কৃত সাহিত্যে বিশিষ্ট রচনা ।

সমাজের ইতিহাস — সাধারণ মানুষ নিয়েই সমাজ । এই যুগে যে সমস্ত পর্যটক এদেশে এসেছিলেন তাদের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে দেশে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো । পাঠান যুগের ইতিহাসে জানা যায় যে গৌড়ের হিন্দু জমিদারগণ যে যত বেশী স্বর্ণপাত্র বের করতে পার - তেন তিনি ততই ঐশ্বর্যবান বলে শুদ্ধার আসন পেতেন । মানসিংহ বাঙলাকে এই কলঙ্ক থেকে উদ্ধার করেন । তিনি জমিজমার সুব্যবস্থা করে , অর্থনীতি ও রাজস্বের দিক থেকে দেশের উন্নতি করলেন । কিন্তু মোঘল যুগের প্রথম

থেকেই ক্রমে সঙ্কট দেখা দিল, নানা খাতে বাঙলার মুদ্রা বাইরে চলে যেতো। কিন্তু সাধারণ লোকের অবস্থা যে ধীরে ধীরে অবনতির পথে যাচ্ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে আমরা হিন্দুর উপর মুসলমানদের অনেক অত্যাচারের কাহিনী পড়েছি। অবশ্য কেউ কেউ প্রয়োজনবোধে মুসলমানী আদব কায়দা গ্রহণ করেছিলেন। আবার কেউ বা স্বেচ্ছায় নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। জয়ানন্দ লিখেছেন —

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
যোজা পাএ নড়ি হাতে কামান ধরিবে।। (চৈতন্য মঙ্গল)

সমস্ত ষোড়শ শতাব্দী ধরে এই ধর্মান্তর গ্রহণের খেলা চলেছিল এবং মুসলমান সাহচর্যে সমাজের বন্ধনও শিথিল হয়ে পড়েছিল। চৈতন্যাবির্ভাবের ফলে দেশে বিচিত্র বিদ্যা ও বিশেষত ন্যায় দর্শনের চর্চা বিস্তার লাভ করেছিল এবং ন্যায় দর্শন ও স্মৃতিতন্ত্র প্রভৃতির চর্চার কেন্দ্র হয়েছিল নবদ্বীপ, নবদ্বীপই প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণ দেব-দেবীর পূজা করতো এবং চন্ডী বা মনসার পূজার দোহাই দিয়ে গোপনে মদ্য মাংস প্রভৃতি খেয়ে লৌকিক দেবতার উপাসনায় প্রচুর ধন ব্যয় করতো। এমতাবস্থায় বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠন করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে।

মঙ্গলকাব্য কি ? এই কাব্যের স্বরূপ —

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতায় মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি কবি কঙ্কণের উল্লেখ করেছিলেন মাত্র।

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৭৭ সালে ইংরেজী ভাষায় -'Literature of Bengal' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন তাতে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের বিস্ময়কর প্রতিভার বিশ্লেষণ ছিল, কিন্তু তাতেও মঙ্গলকাব্য নামক কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থের সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করেন নি। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে কবিকঙ্কণের কাব্যকে এবং কেতকাদাসের কাব্যকে 'মনসার ভাসান' বলেছেন। দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মঙ্গলকাব্যকে সাহিত্যের এক বিশেষ শ্রেণীরূপে বর্ণনা করেছেন।

মঙ্গলকাব্যকে অন্তত: দুটি বিশেষ স্তরের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করতে হয়েছে। প্রথম স্তরটিকে বলা যায় ব্রতকথা। বলাবাহুল্য যে লৌকিক দেবদেবীর প্রসাদ প্রার্থনার জন্যই অন্ত:পুরের মেয়েরা ব্রতছড়ার সাহায্য নিতেন এবং আলপনা ও বিভিন্ন প্রতিচিত্রের দ্বারা দেবদেবীর বন্দনা করতেন। ব্রতছড়ার কোন রচনাকার নেই। সমাজই ব্রতকথার স্রষ্টা, সমাজ-মানুষ থেকেই এর আবির্ভাব। অনুমান হয় মুসলমান অভিযানের আগেই সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা এবং ব্যাধের দেবী চন্ডীর লীলা প্রচারের জন্য অনেক ছোট খাটো কাহিনী সমাজে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় স্তরে পুরুষ সমাজেও মেয়েলী ব্রতকথা পঠিত হতো অথবা গৃহীত হতো। দ্বিতীয় স্তরেই কাহিনীর উৎপত্তি।

মঙ্গলকাব্যের পটভূমি ও বিষয়বস্তু :—

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেছেন, অতি প্রাচীনকালে যখন আর্য প্রভাব এদেশে শুরু হয়নি তখন এই অঞ্চলে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কৃষিজীবী এক আদিম জাতি বাস

করতো । তাদের আচার আচরণ ব্রত এবং সেই সঙ্গে জন্ম মৃত্যুর পরে বিভিন্ন কৃত্য আর্য প্রভাবের ফলে অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় । পরে যখন আর্য-অনার্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রনে একটি মিশ্র নৃ-তাত্ত্বিক জাতির উদ্ভব হলো তখন থেকেই গৌড় বঙ্গের অধিবাসীরা প্রাণপণে আর্য হতে চেষ্টা করতে লাগলো । সমাজে যে সমস্ত পুরুষ বাইরে কাজ কর্ম করতো তারা চাষবাস, যুদ্ধবিগ্রহ ও ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতো । কিন্তু অনগ্রসর পুরুষ সম্প্রদায় এবং অন্ত:-পুরবাসিনী স্ত্রীসমাজ এত সহজে আপনাপন কুলাচার ও গার্হস্থ ধর্মের বৈশিষ্ট ত্যাগ করতে পারেনি । সমাজের আর্যভাবাপন্ন উচ্চ বর্ণ থেকে এই অনগ্রসর পুরুষ ও অন্ত:পুরবাসিনী স্ত্রী সমাজ তাদের বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে রইলো । ক্রমে তাদের দেবীরা কিছুটা সংস্কৃত প্রভাবে মার্জিত হয়ে আর্যদের দেবমন্ডপে স্থান করে নিলেন ।

যে সমাজ জগতকে ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করে, যারা জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য আত্মশক্তি ও বুদ্ধিতে অবিশ্বাসী, তাদের আধিভৌতিক উৎপাতের হাত থেকে রক্ষার জন্য এক একটি উৎপাতের দেবতার সৃষ্টি করতে হয় । আর্দ্র ভূমির দেশ বাঙলা — এখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর এবং সর্বত্র সাপ । সুতরাং মনসার বন্দনা করলে সর্পাঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, চন্ডীর উপাসনা করলে সমস্ত আপদ কেটে যাবে, দক্ষিণরায়ের পূজা করলে আর বাঘ কুমীরের আক্রমনে প্রাণ দিতে হবে না, এমনি করে অসহায় কৃষিজীবী সমাজ, উৎপীড়িত নিম্নবর্ণের জনসাধারণ ভয়ে ভক্তিতে মনসার ভাসান গেয়েছে, চন্ডীর মঙ্গল গান বেঁধেছে, রঞ্জাবতী লাউসেন ও কলিঙ্গার অদ্ভুত কাহিনী শুনেছে ।

সুতরাং মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় রয়েছে এক বিশাল গ্রামকেন্দ্রিক জলজঙ্গল বেষ্টিত নদী মাতৃক বাঙলা দেশ , যেখানে অশিক্ষিত নরগোষ্ঠীর লোকই প্রধান — যারা শিক্ষায় ও সভ্যতায় পুরোপুরি আর্যত্ব লাভ করতে পারেনি ।

আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে বাঙলার শাসক ছিলেন মোগল ও পাঠান । এই সুদীর্ঘ কালের একদিকে আছে বৈষ্ণব পদাবলী এবং জীবনচরিত সাহিত্য , রামায়ণ , মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ , নানা লৌকিক দেবতার মহিমাকীর্ত্তনকারী মঙ্গলকাব্য সমূহ — অন্যদিকে আছে অন্যান্য বিচিত্র গুণময় কাব্য ও আখ্যানকাব্য সমূহ । আখ্যানকাব্যগুলিতে মধ্যযুগের বাঙলাদেশের সমাজচিত্র বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে ।

মধ্যযুগের কাব্যে সেই যুগের যে সমাজব্যবস্থা প্রতিবিম্বিত হয়েছে তার মোটামুটি একটা চিত্র আমরা তুলে ধরতে পারি । সমস্ত সমাজেই নারীর ভূমিকা সমাজদেহে পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই হীন নয় । পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় একথা সাধারণভাবেই বলা চলে যে সে যুগের মানুষ দৈবনির্ভর ছিল । সাহিত্যেও সেই দৈবনির্ভরতার প্রতিফলন ঘটেছে । নারীর স্থান ছিল গৃহের অভ্যন্তরে — এটাই স্বাভাবিক ।

'' ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি'' -অর্থাৎ স্ত্রীজাতি স্বাধীনতার যোগ্য নয় — এতো মনুরই বচন । একটা কথা মনে রাখতে হবে , আমাদের দেশে যারা সমাজ গঠনের জন্য , সুস্থ গৃহজীবন পরিকল্পনার জন্য নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন

সেই স্মৃতিকারদের মধ্যে মনু , যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরই প্রধান । কিন্তু এই নির্দেশগুলি যতই মঙ্গলজনক হোক না কেন আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণ - কর হয়েছে কি না বলা কঠিন । এঁরা সমাজ নির্মাণের জন্য উপদেশ দিয়েছেন , আমরা অন্যভাবে সেই নিয়মগুলি অনুসরণ করেছি । নারী জাতি অন্যায় করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র জপ করেছে । ফলে সমাজের নরনারী একটি 'প্যাটার্ণে' গঠিত হয়েছে । মনু বলেছিলেন — ' ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি ' — কেননা স্ত্রী জাতির মন স্বভাবতই চঞ্চল । তাকে সতর্ক প্রহরার মধ্যেই রাখা প্রয়োজন । কিন্তু সংহিতার নবম অধ্যায়ে মনুর বিধানগুলি যে ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আমাদের প্রশংসার দাবী করতে পারে না । সমাজের সকলেই স্মৃতির বিধানে তটস্থ এবং বিস্ময়ের বিষয় এই বিধানগুলির ভয়ে আমাদের দেশের শিল্পী সাহিত্যিকেরাও যেন স্বচ্ছন্দভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না । অর্থাৎ এই বিধা ন তাঁদের স্বাধীন চিন্তা পর্যন্ত হরণ করেছে । তাঁরা যে রাজ্যে বিচরণ করতেন তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে 'কলের পুতুলের ' রাজ্য । একজন বিদগ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত এই সমাজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন , **'Mummification of social life'** — আমরা বলি এ যেন যক্ষপুরী বা অচলায়তন । সবাই যেন কতকগুলি বিধান মেনে চলাকেই জীবনের সার সর্বস্ব বলে মনে করেছেন। সমাজের মেয়েদের অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক ছিল তাতে সন্দেহ নেই , এবং ছিল বলেই বিভিন্ন স্মৃতি শাস্ত্রে তার অনুলেখন রয়েছে , এবং এই স্মৃতি-শাস্ত্রে এই সম্পর্কিত বিধান ছিল বলেই শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । কালিদাসের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র

-কিন্তু তিনিও রঘুবংশকাব্যে রাজা দিলীপের বর্ণনায় বলেছেন -''রেখা-মাত্রম্ ন ব্যতীয়ুরামনো বর্ত্মনঃ পরম্ ।'' অর্থাৎ দিলীপের রাজত্বে এমন সুশাসন ছিল, তখন রাজা ও প্রজাগণ মনুবিহিত জীবনচর্যার আদর্শ থেকে রেখামাত্র বিচ্যুত হয়নি । কিন্তু এটা গৌরবের কথা নয়, প্রশংসার বিষয় নয় । নিয়মের শৃংখলে বাঁধা পড়ে প্রজাদের কোন চ্যুতি ঘটাবার শক্তিই তো ছিল না । এই সেই দিন পর্যন্তও আমরা প্রথার দাসত্ব করে সতীকে চিতার আগুনে দগ্ধ করে উল্লাসে নৃত্য করেছি । খোলামন নিয়ে বিচার করলে মনুর বিধানগুলিকে সংশোধন করবার প্রশ্ন উঠবে ।

মনসামঙ্গলকাব্যে বিবৃত হয়েছে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীমনসার কথা ও কাহিনী । অতি প্রাচীন যুগেও আদিম মানব সমাজে সর্পোপাসনার সন্ধান পাওয়া যায় । প্রাচীন যুগে আদিম সমাজের মানুষ সাপ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকে ভয় করতো এবং আত্মরক্ষার জন্য তার পূজা অর্চনা করতো । ভারতের অস্ট্রিক গোষ্ঠী অপেক্ষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে সর্প পূজার অধিক প্রচলন ছিল । আসামের কোন কোন অধিবাসীর মধ্যে এখনও এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । এই সমস্ত আর্যেতর সংস্কার আর্যজাতিকে প্রভাবিত করেছিল । তারা অনার্যদের উপর শুধু উৎপাত করেনি তাদের অনেক সংস্কার ও আচার ব্যবহার গ্রহণও করেছে । বেদেও সর্পপূজার কথা আছে ।

সে যুগে নারী জাতি যে সমাজে মর্যাদাহীন ছিলেন তার একটি সুন্দর চিত্র আমরা বিজয়গুপ্তের পদ্ম পুরাণে পাই : -

ব্রাহ্মণের নারী হইয়া নাহি ধর্মজ্ঞান ।
ভাওগড়ার ঝি তুই কিসে অপমান ।। (পৃ - ৮৫)

যেহেতু তিনি স্বামী, সেহেতু তার নারীর উপর এমনি অধিকার যে তার একটি কথা অমান্য করলে নারীকে নিকৃষ্ট গালিগালাজ শুনতে হবে । নারীর হৃদয়ের যেন কোন দাম নেই । আধুনিক মানসিকতা দিয়ে পুরুষের এই আচরণকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না ।

কিন্তু সামাজিক অনুশাসন এতই কঠোর ছিল যে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর উপর সামাজিক নির্যাতন স্বামীর নির্যাতন অপেক্ষাও অত্যন্ত অসহ - নীয় ছিল । তাই সামাজিক নির্যাতন অপেক্ষা স্বামীর নির্যাতনকেই নারীরা মুখ বুজে, মাথা নীচু করে সহ্য করা অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করতেন । জরৎকারুর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে মনসা তাঁকে অচৈতন্য করে দিয়েছিলেন । কিন্তু পিতা শিবের অনুরোধে চৈতন্য ফিরিয়ে দিলেন। যখন জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করে চলে যাবার উপক্রম করলেন তখন মনসা : -

মুনির চরণে ধরি করিল প্রণতি ।
অপরাধ ক্ষমা কর রাখ রাঙা পায় ।।
স্ত্রীলোকের অপরাধ ক্ষমিতে উচিত হবে ।

(বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ - পৃ:৯১)

একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় - মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে

এমন একটা মানবীয় আবেদন প্রাধান্য পেয়েছে যে বাঙলাদেশে রামায়ণ কাহিনীর মত এর ঘটনা ও চরিত্র প্রায় কারও অজানা নয়। এই কাহিনীতে ব্রতকথা, ব্যালাড, ও মহাকাব্যের মিশ্রণ ঘটেছে। ব্রতকথার সরল ঋজু কাহিনী, ব্যালাডের শিথিল ঘটনা বিন্যাস ও মহাকাব্যের বিশালতা এই কাব্যের কাহিনীকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। এই ব্যালাড বা বিশাল কাহিনীর অন্তরালে যে কোনও একটা বাস্তব ঘটনার প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু চাঁদ সদাগরের কাহিনীর স্থান, নদ-নদী, গ্রাম-জনপদের নাম গোটা বাঙলাদেশে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে তার ঐতিহাসিক অংশ খুঁজে বার করাই কঠিন।

মনসামঙ্গল কাব্যের চারটি শ্রেণী :—

ক) পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্য - এই কাব্যের প্রধান কবি নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, বংশীদাস ও ষষ্ঠীবর।

খ) রাঢ়ের পদ্মাপুরাণ - এই কাব্যের প্রধান কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ।

গ) উত্তরবঙ্গ ও আসাম - এই কাব্যের প্রধান কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ও তন্ত্রবিভূতি।

এই সব অঞ্চলের মনসামঙ্গলের কাহিনীতে নানান বৈচিত্র্য ও কাহিনী আছে। মনসামঙ্গলে চাঁদের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব কাহিনী বাঙলা -

দেশে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । কাহিনীর প্রথম অংশ দেবখন্ড । এই খন্ডে মনসার জন্ম থেকে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য অবতরণ পর্যন্ত বর্ণিত আছে ।

।। মনসামঙ্গলের কাহিনী ।।

মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচারের জন্য প্রথমে এক দেবী কল্পিত হয়েছেন । তাঁর অনুগ্রহ পেলে আর সর্পদংশনের ভয় থাকে না ।

মনসা দেখলেন নিম্নবর্ণেরা ভয়ে বা ভক্তিতে তাঁর পূজা করে বটে কিন্তু সমাজের প্রধান বণিকদের পূজা না পেলে উচ্চ সমাজে তাঁর পূজার প্রসার হবে না । বণিক সমাজের প্রধান ছিলেন চাঁদসদাগর । তিনি পরম শৈব , কিছুতেই মনসার পূজা করবেন না । মনসা নানাভাবে তাঁকে বিপর্যস্ত করলেন , কিন্তু চাঁদ তাঁর সঙ্কল্পে অটল রইলেন । মনসার ক্রোধে চাঁদের মধুকর সহ সপ্তডিঙ্গা জলে ডুবে গেল, ছয় পুত্রের মৃত্যু হলো, তবুও চাঁদ ভ্রুক্ষেপ করলেন না ।

মনসার ইচ্ছায় স্বর্গের ঊষা ও অনিরুদ্ধ মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করলেন । অনিরুদ্ধ চাঁদবণিকের ঘরে এবং ঊষা সায়বেণের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন । মর্ত্যলোকে তাঁদের নাম হলো লখিন্দর ও বেহুলা । কালক্রমে লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহ হয়ে গেল । পাছে মনসা তাদের কোন অনিষ্ট করেন তাই চাঁদ সাঁতালি পর্বতে লোহার বাসর ঘর

101695
26 JUL 1989
NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR

নির্মাণ করলেন । কিন্তু মনসার চক্রান্তে সামান্য ছিদ্রপথে তাঁর অনুচর কাল-নাগিনী বাসর ঘরে প্রবেশ করে লখিন্দরকে দংশন করলো । লখিন্দরের মৃত্যু হলো, চাঁদ মৃত পুত্রকে কলার ভেলায় তুলে জলে ভাসিয়ে দিলেন - বেহুলাও স্বামীকে নিয়ে ভেসে চললো নিরুদ্দেশের পথে । বহু আপদ বিপদ পার হয়ে বেহুলা স্বর্গে গিয়ে তার নৃত্যে ও গীতে মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করলো । মহেশ্বর লখিন্দরের জীবন ফিরিয়ে দিলেন । মহেশ্বরের বরে তার ছয় ভাসুরও জীবন ফিরে পেলো । বেহুলা সকলকে নিয়ে দেশে ফিরলো । পুত্রবধূর অনুরোধে এইবার চাঁদ মনসার পূজা করলেন । তবু ডান হাতে নয় - বাম হাতে ।

মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচারিত হলো । পরে যথাকালে অনিরুদ্ধ ঊষা নরদেহ ত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে গেলেন ।

।। দুই ।।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য শুনেছি , —

"It is the distance that lends enchantment to the view." —

অর্থাৎ দূরত্বই কল্পনায় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে । যাদের আমরা দেখিনি , যাদের সম্পর্কে কোন ধারনাই আমাদের নেই, আমরা আমাদের কল্পনার

রঙ মিশিয়ে তাদের নতুন করে সৃষ্টি করি। উজ্জয়িনীর নাগরিকগণ কিভাবে জীবন যাপন করতেন আমরা জানি না। উজ্জয়িনীর নিসর্গ সৌন্দর্য আমাদের কাছে অপরিচিত, তবুও আমরা কল্পনার দৃষ্টিতে যে উজ্জয়িনীকে দেখি, পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যই সেখানে পরাভূত। কিন্তু এতো গেল দূরত্বের কথা, কাছের জিনিষকে সুন্দর দেখবার উপায় কোথায়? সৃষ্টির আদিম কাল থেকে নর ও নারী পাশাপাশি অবস্থান করেছে, ব্যবহারিক জীবনে প্রতি মুহূর্তেই তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়—সেখানে তো কল্পনার কোন অবকাশ নেই। নারীকে প্রত্যেক নরই প্রত্যক্ষভাবে চেনে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বাঙলাদেশে যে সমাজ জীবন ছিল নানা দিকে নানা বিষয়ে আমরা সে যুগ অতিক্রম করে এসেছি। জনৈক ঐতিহাসিক বলেছেন—

''বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে গৌড়ের নারীদের মৃদুভাষিণী, অনুরাগবতী এবং কোমলাঙ্গী বলে তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে যে উক্তি করেছেন তা আজও মোটামুটি সত্য বললে ইতিহাসের অপলাপ করা হয় না। কিন্তু বাৎস্যায়নের উক্তির ভিতর প্রাচীন বাঙালী নারীর সমগ্র ছবিটি যে পাওয়া যাচ্ছে না তা না বললে ঐতিহাসিকের কর্তব্য করা হবে না।

গোড়াতেই বলা চলে, বৃহত্তর হিন্দু সমাজের গভীরে—শিক্ষিত নাগর সমাজের কথা বলছি না—আজও যে সব আদর্শ, আচারঅনুষ্ঠান সক্রিয়, প্রাচীন বাঙালী সমাজেও তাই ছিল। যে সব সামাজিক রীতি ও অনুষ্ঠান পল্লী ও নগরবাসী সাধারণ নারীরা দৈনন্দিন জীবনে আজও পালন করে থাকেন, যে সব সামাজিক বাসনা ও আদর্শ আজও পোষণ

করেন, প্রাচীন বাঙালী নারীদের মধ্যেও মোটামুটি তাই সক্রিয় ছিল। বাংলার লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যই তার প্রমাণ।" (বাঙালীর ইতিহাস - ডঃ নীহার রঞ্জন রায় - পৃ - ২৯১)।

ঐতিহাসিকের কতকগুলি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে তা ঠিক। কিন্তু এই ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত এই যে প্রাচীন সমাজের সামাজিক জীবনের যে আদর্শ ছিল এখনও মোটামুটি তাইই আছে। আছে বলেই সে যুগের স্মৃতিকারগণ যে নারী সমাজের চিত্র এঁকেছেন সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এক কথায় সাহিত্য স্মৃতির আদর্শে প্রভাবিত।

ঠিক সেই কথারই প্রতিধ্বনি পাই অন্য এক বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের রচনায় -- " ..... Certain remarks of Vātsyāna indicate that women of the royal harem of Vanga were not accustomed to move out freely, and spoke with outsiders from behind a curtain. Women were educated and probably many of them were literate. In ancient Bengal, as in the rest of India, a woman had hardly any independent legal or social status except as a member of the family of her father and husband." -- (Dr. R.C.Majumder--- History of Bengal, Volume- I, page No. -609).

এর অর্থ এই যে সে যুগে পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল, পর্দার আড়ালে থেকেই নারীগণ আলাপ আলোচনা করতেন পরপুরুষের সঙ্গে - এক কথায় নারীদের কোন পৃথক সত্তার স্বীকৃতি সেই সমাজে ছিল না । এই সর্বথা বন্দী নারী সমাজের চিত্রই আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে পেয়েছি ।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাব একদিন সমাজ গঠনে ছিল অপরিসীম । শিল্পী ও সাহিত্যিকেরাও তাঁদের রচনায় নারীর যে চিত্র এঁকেছেন তা স্মৃতিশাস্ত্রেরই অনুগামী । সব মিলিয়ে সে যুগের নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয় ।

লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী রচিত 'পবনদূত' কাব্যে যে নারী জাতির বর্ণনা রয়েছে তাতে দেখা যায় পর্দা প্রথা তাতে অব্যাহত, তবে কিছু শিথিল, এই পর্যন্ত । বাৎস্যায়নের কয়েকটি উক্তি থেকে বোঝা যায় সেই যুগের রাজান্তঃপুরের মেয়েরাও স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারতেন না এবং তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিতা ছিলেন । স্মৃতিকার জীমূতবাহন স্বামীর মৃত্যুর পরে বিধবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে যথেষ্ট লড়াই করেছিলেন । তাঁর সময়ে অন্য কোন উত্তরাধিকারীর অভাবে নারীরা ন্যায্য উত্তরাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতেন । তিনি বিস্তৃত তর্ক ও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে স্বামীর অভাবে মেয়েদের দাবী সর্বাগ্রে গ্রাহ্য হবে। কেবলমাত্র ভরণপোষণের দাবী মিটলে চলবে না । অবশ্য বিধবা নারী সম্পদ বিক্রী করতে পারতেন না । এবং তার জীবনও সৎজীবনের নীতির

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক এইটিই বাঞ্ছনীয় ছিল। তাকে স্বামীর পরিবারেই বাস করতে হবে, পিতা, মাতা তার সঙ্গে থাকতে পারেন, তবে তাকে সর্ব - প্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করে থাকতে হবে।

আসল কথাটা এই সমাজে যে নারীর চিত্র আছে, শিল্পী বা সাহিত্যিক যখন সে নারীর চিত্র অঙ্কিত করবেন তিনি যথাস্থিত ভাবে অনুকরণ করে যাবেন এর কোন যুক্তি নেই। কবি কালিদাস শিল্পীর দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর কাব্যে যক্ষ তাঁর প্রিয়ার কাছ থেকে নির্বাসিত, সেই প্রিয়া একজন কিন্নরী মাত্র, আমাদের সমাজের কেউ নয়। তাঁর নাটকের পুরুরবা উর্বশীর প্রণয়লিপ্সু, কিন্তু উর্বশীও আমাদের সমাজের কেউ নয়, সে স্বর্গের নর্তকী। আর তাঁর কাব্যে আছে উমা ও মহেশ্বরের প্রণয় লীলা। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাস এই বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পঞ্চরাত্র নামক নাটকে দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত পান্ডবদের ন্যায্য দাবী মিটিয়ে দিয়েছেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও হয়নি। কবি বা সাহিত্যিক - তাঁরাও তো শিল্পী, সুতরাং তাঁরা সকল ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলবেন এর কোন যৌক্তিকতা নেই এবং কেউ কেউ মেনেও চলেন-নি। শিল্পীর রচনায় যদি আমরা নতুন সৃষ্টি না পেলাম তাহলে আর পাব কোথায়? সে যুগ আমরা নিশ্চয়ই অতিক্রম করে এসেছি - যে যুগে বিধবাদের মৎস্য, মাংস প্রভৃতি যে কোনরূপ উত্তেজক পদার্থ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল, কোন মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গল-সূচক বলে পরিগণিত হতো এবং তারা সাধারণত উৎসব ও অন্যান্য

মঙ্গল অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারতেন না ।

নারীদের যৌনশুচিতা ও সতীত্বের আদর্শ স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন এবং সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাই ছিল । তা সত্ত্বেও বিত্তবান নাগর সমাজে তার ব্যতিক্রম ও ছিল না । সেই আদর্শ সমাজেও বলপূর্বক ধর্ষিতা নারী সেই যুগেও সমাজে পতিত বা সমাজ - চ্যুত বলে গণ্য হতেন না এবং বিধিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানেই তা শুদ্ধি হয়ে যেতো ।

এ বিষয়ে মনুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাক । মনুসংহিতার নবম সর্গে আছে —

''পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্ ।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্ ।।'' (১৩)

সুরাপান, অসৎপুরুষের সঙ্গে সংসর্গ, পতি বিরহ, ইতস্তত: ভ্রমণ , অকারণ নিদ্রা এবং পরগৃহে বাস — এই ছয়টি স্ত্রীলোকের ব্যভিচার দোষের কারণ ।

''নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতি: ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ।।'(১৪)

এরা রূপ বিচার করে না , বয়স সম্পর্কেও এদের কোন বিচার নেই , সুরূপ বা কুরূপ — পুরুষ হলেই হল - পুরুষ পেলেই এরা ভোগের জন্য অধীর হয়ে ওঠে ।

এই শ্লোকটির ইঙ্গিত এত কদর্য্য যে প্রতিবাদেরও অযোগ্য ।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতি: ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রীয়োঽনৃতমিতি স্থিতি: ।। (১৮)

শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী স্ত্রীজাতির কোন সংস্কার মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না । এই জন্যই এদের চিত্ত শুদ্ধ হয় না , এরা স্মৃতি ও শ্রুতি রহিত তাই এরা ধর্ম্মজ্ঞ হতে পারে না । এরা মন্ত্রহীন , তাই পাপের স্পর্শ ঘটলে তারা মন্ত্রের সাহায্যে তার ক্ষালন করতে পারে না । এই জন্য তারা মিথ্যার মতই অশুভ ।

আমাদের মন্তব্য এই স্ত্রীজাতির সম্পর্কে মনুর মনোভাব আমরা জানি, সুতরাং এই জাতীয় নারীর স্তুতি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না । কিন্তু মনুর ভাষ্যকার কুল্লুকও এই বিষয়ে নীরব হয়ে রইলেন এটাই বেদনাদায়ক । মনু নারী জাতি সম্পর্কে আর যে সব মন্তব্য করেছেন তা হলো — এরা সন্তান উৎপাদনের জন্য গৃহের উপকারিণী । সুতরাং তাদের সযত্নে রাখবে । মেয়েরা স্বাধীনতার যোগ্য নয় । শুধু সন্তানের উৎপাদন, প্রতিপালন, অতিথি স্বজনের সৎকার প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্ম নারী-দের প্রধান অবলম্বন ।

মনুসংহিতার বারটি অধ্যায়ে মনু নারীজাতি সম্পর্কে বহু বিরোধী উক্তি করেছেন । সুতরাং নির্বিচারে তা অনুসরণ করা কঠিন । তবে সমাজে নারীগণ যে হীন জীবন যাপন করতেন এরকম একটা আভাষ এই

স্মৃতিদর্শনে পাওয়া যায় ।

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারও অন্যত্র বলেছেন — ''সে যুগে মেয়েদের কোন আইনসঙগত অধিকার ছিল না , বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ার জন্য নারীজাতি নানাবিধ দুর্দশার অধীন হতেন । সমাজে কৌলীন্য প্রথা ছিল একটি রোগ বিশেষ —— " The prevalence of polygamy must have made their lives at home somewhat irksome . Inspite of strong insistence of physical chastity of women , contempo-rary evidence , indicates that there was a certain amount of laxity in this respect . Mention may , however , be made in this connection of one redeeming feature in society which offers a striking contrast to modern ideas . " - (Dr. R. C. Majumder - The History of Bengal - Volume - I . Hindu Period , page No. 609 - 611) .

— সেন রাজত্বের পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কৌলীন্য প্রথা বাঙলাদেশে দৃঢ়মূল ছিল । এই প্রথার মহিমায় বহু নারী যে হীন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার নিদর্শন মধ্যযুগের বাঙলাদেশে ছড়িয়ে আছে । সাহিত্যের বিবরণ এখানে দেওয়ার অবকাশ নেই - এখানে শুধু আমরা সে যুগের সমাজ ব্যবস্থায় নারী জাতির অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে উৎসুক ।

ধরা যাক, পুনর্ভূনারীদের কথা । এই জাতীয় নারী প্রসঙগ এসেছে বিধবাদের পুনরায় বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনায় —

"In so far as the punarbhu is concerned, Vatsyayana gives us a somewhat different view of her status. The punarbhu is a widow who, being smitten with love through inability to control her passion, unites herself again with a man seeking pleasure and having excellent qualities. In choosing her mate she follows, above all, the inclinations of her heart. She persuades her lover to spend money on drinking parties, garden parties etc. At her lover's house she assumes the role of a mistress, being affectionate to his wedded wives, generous to his servants and friendly with his companions. " - (Dr. R.C.Majumder - The History and culture of the Indian people - page No. 571 - 572).

এর তাৎপর্য — বাৎস্যায়ন পুনর্ভূনারীদের সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন যে , এই নারীর জীবন যাত্রার আদর্শ অত্যন্ত কঠিন । পুনর্ভূ অবশ্য সেই নারী যিনি বৈধব্য পালনে অসমর্থ হয়ে এবং প্রেমধর্মের আকর্ষণে অন্য পুরুষের সঙেগ বিবাহ বন্ধনে যুক্ত হন । এই পুনর্ভূ নারী তার মনের অতৃপ্ত আকাঙক্ষার নিবৃত্তি কল্পেই বিবাহিত হয়েছেন এবং তিনি তার প্রেমিককে সুরাপানে এবং উদ্যান সম্মিলনী প্রভৃতিতে যথেচ্ছ ব্যয় করতে উৎসাহিত করেন । গৃহের অন্যান্য দাস - দাসী এবং আত্মীয় পরিজনের তিনি স্নেহপরায়ণ হন । তবে সৌভাগ্যের বিষয় সমগ্র মধ্যযুগের

সাহিত্যে এবং বলতে কি বাঙলা সাহিত্যের কোন পর্বেই এই পুনর্ভূ নারীর দর্শন সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় যে বিধবারাও প্রয়োজন বোধে বিবাহিত হতেন যদিও এরূপ বিবাহের সংখ্যা নগণ্য।

এই পর্যন্ত যে উদ্ধৃতিগুলো দিয়েছি তাতে এইটুকু প্রমাণিত হয় সে যুগের সমাজব্যবস্থায় নারীদের অবস্থা কোন দিক থেকেই আকর্ষণীয় ছিল না। এই উক্তি বিবাহিত নারীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। —

" References in the general as well as technical literature of the early centuries before and after christ seem to indicate that married women in high families did not usually appear in public without veils . This custom was probably continued in the Gupta Age . The silence of Hiuen Tsang and Itsing , however , indicates that the women did not generally observe the purdah and remain in seclusion . For such a peculiar custom to which they were absolute strangers , would surely have been noticed by them . Besides , as noted above ; sculptured representations of female figures definitely negative the idea of a purdah. "
(Dr. R.C.Majumder, The History & Culture of the Indian people — page no. 574)

অর্থাৎ খ্রীস্টীয় শতাব্দীর আগে এবং পরে সামাজিক প্রথা এই ছিল যে শিক্ষিত নারীগণও সাধারণত পর্দা প্রথাকে মেনেই চলতেন - সাধারণত তাঁদের অন্ত:পুরের বাইরে দেখা যেতো না , বাইরে যেতে হলে তাঁরা অবগুন্ঠন ব্যবহার করতেন । গুপ্তযুগেও এই প্রথার প্রচলন ছিল । পরিব্রাজক হুয়েনশাং এবং ইৎসিং এর নীরবতা দেখে মনে হয় যে নারীরা সাধারণত পর্দা প্রথা অনুসরণ করতেন না । তাঁরা জনসাধারণ থেকে একটু দূরেই থাকতেন । এই অদ্ভূত প্রথা খুব সম্ভবত গুপ্তযুগেও প্রচলিত ছিল । তবে এই প্রচলন কেবলমাত্র বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল , কিন্তু গুপ্ত সভ্যতার সংস্কৃতির সূচক যে সমস্ত প্রতিমূর্তি আমরা পেয়েছি তা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না ।

নারী সমাজ সম্পর্কে একটি কথা আমাদের গোড়াতেই মেনে নিতে হবে যে প্রাচীন ইতিহাসে আমরা নারী সমাজের যে চিত্র পেয়েছি তা শুধু সেন ও পাল বংশের আমলে প্রচলিত ছিল না — মধ্যযুগেও মোটা-মুটি একই সমাজ ব্যবস্থা ছিল । কৌলীন্য প্রথার কথাই ধরা যেতে পারে। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলের বণিকখন্ডের শুরুতেই আমরা ধনপতি সদাগরের নিজ শ্যালিকাকে বিবাহ করার অনুরোধে আগ্রহান্বিত দেখতে পাই । উপলক্ষ্য অবশ্য পাসুরা । আর শ্যালিকা জামাইবাবুর সঙ্গে পাসুরা নিয়ে লুকো-চুরি খেলবে এতে কোন অস্বাভাবিকতা দেখি না । কিন্তু সেই সূত্রে লহনার মত সতীসাধ্বী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও খুল্লনাকে বিয়ে করে আনার প্রস্তাবে আধুনিক রুচির বিকৃতি লক্ষ্য করি । আরও আশ্চর্যের কথা এই যে নারী যেন পুরুষের কাছে নির্বোধ শিশু । শিশুকে যেমন পুতুল দেবার প্রলোভন

দিয়ে অনেক গুরুত্ব দাবী থেকে ভোলানো যায় তেমনি ধনপতি সদাগর লহনাকে ভোলাতে চেষ্টা করেছেন ।

মধ্যযুগীয় সামন্তদের লোভ লালসার কথা মনে রাখলে ''সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'' কাব্যের নায়ক সম্বন্ধে আর কোন মোহ থাকে না। কাব্যটিতে যে পরকীয়া প্রেম দেখতে পাই তা একান্তভাবেই দরবারী প্রেম। এ প্রেমমূলক কাহিনীর নায়ক লোরকরাজ গোহারী রাজ্যের মোহরা রাজার কন্যা চন্দ্রানীর সঙেগ যে প্রেম করে তা সামাজিক স্বীকৃতি পেতে পারে না । এই ঘটনার মধ্যে সামন্ত রাজার শক্তির পরিচয় থাকলেও সুরুচির কোন ছাপ নেই । মোহরা নৃপতি মঙগল বিধান দ্বারা পরম আনন্দ সহকারে শূরবংশের ধনুর্ধর বীর অবতার বামনের সঙেগ চন্দ্রনীর বিয়েও দিয়েছিলেন । এই তো হলো মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের মূল্যায়নের একটি দৃষ্টান্ত । আর তার পতির সঙেগ আবার বিয়ে হলো চন্দ্রানীর । কিন্তু এসব কথাই অপ্রাসঙিগক । মনু তার নবম অধ্যায়ে নিয়োগ প্রথার প্রশ্নও আলোচনা করেছেন । অর্থাৎ সমাজ সুগঠিত হওয়ার আগে , নারী পুরুষের বিবাহ পদ্ধতি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে যে নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল ধৃতরাষ্ট্র , পান্ডু ও বিদুর তো সেই নিয়োগ প্রথারই ফল। মনু এই নিয়োগ প্রথাকে আপদ ধর্ম হিসেবেই দেখেছেন । এই নিয়োগ প্রথায় বিধবারও পুত্র ধারণ করা চলতো প্রয়োজনের বিধি মানতে গিয়ে । নিয়োগ প্রথা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় । কারণ এই প্রথায় নারীকে দেখা হয়েছে শুধু সন্তান

উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে। এই নিয়োগ প্রথা সম্পর্কে আলোচনার শেষে মনু নারী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা কোনক্রমেই এই জাতির পক্ষে গৌরব জনক নয়। মনু বলেছেন — '' নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈঃ'' — অর্থাৎ নারীদের কোন সংস্কারই মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। এরা মন্ত্রহীন তাই এরা অশুচি। কোন্ অপরাধে, সমাজের কোন্ ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে গিয়ে যে নারীদের এই অধিকারে বঞ্চিত করা হলো তা দুর্বোধ্য। মনু যে ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন —

নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ ।। (৯.১৮)

স্ত্রী জাতির কোন কর্মই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। ধর্মশাস্ত্রের এই বিধান, এরা স্মৃতি ও শ্রুতিহীন, তাই এরা ধর্মজ্ঞ হতে পারে না। এরা মন্ত্রের স্পর্শহীন তাই পাপ করলেও মন্ত্রের সাহায্যে তাদের পাপের ক্ষালন হয় না। মনুর শেষ কথা নারী মিথ্যার মতই অশুভ - '' স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি ''।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ।। (৯.২৬)

এই শ্লোকে মনুর প্রশংসাপত্র — নারীগণ সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ। অবশ্য এই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন তারা গৃহের দীপ্তি স্বরূপ অর্থাৎ পূজার যোগ্য। একটু আগেই মনু বলেছেন নারীরা স্বভাবতই

ব্যভিচারিণী তখন তাঁর মনে পড়েনি বিধির বিধানের দ্বারা জনন যন্ত্রের অধিকারিণী , মনে পড়াতেই এত স্তুতি এত উচ্ছ্বাস । কিন্তু আমাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় এ কোন সমাজ -- যে সমাজে নারীদের কোন সম্মান ছিল না -- কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই হেয় জীবন যাপন করতে হতো ? আমাদের বক্তব্য অবশ্য এই হিন্দুর কোন কালে কোন সমাজেই নারীদের এই হেয় অবস্থা ছিল । সুতরাং সমাজে নারীরা হেয় জীবন যাপন করতো বলেই সাহিত্যে তারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন এমন কথা অশ্রদ্দেধয় । বরং একটু ঘুরিয়ে বলা উচিত মনু, যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারেরাই এই জাতীয় বিধানের দ্বারা নারীদের সমাজ জীবনকে বিষময় করেছিলেন ।

নশ্যতীষুর্যথা বিদ্ধঃ খে বিদ্ধমনুবিধ্যত: ।
তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পরপরিগ্রহে ।। (৪৩)[৯]

মনের আনন্দে মনু বিধানের পর বিধান রচনা করে সেই শরে নারীকে বিদ্ধ করেছেন । আমাদের মনে হয় এই উপমাটি এখানে নিষ্ফল। বিবাহিতা স্ত্রীকে যেমন স্বামী নিজের বলে দাবী করবে , বনের মৃগকে তেমনি কোন শিকারী দাবী করতে পারে না । প্রথম শিকারীর শরে বিদ্ধ হয়েও মৃগ যদি পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং পরে দ্বিতীয় শিকারী তাকে অনায়াসে শরবিদ্ধ করতে পারে । তাই নিহত মৃগ নিশ্চয়ই দ্বিতীয় শিকারীর । বনের পশু শিকারী সাধারণের , কোন পশুসংহিতায় এমন কিছু লেখা নেই একজন শরবিদ্ধ করলে সে যদি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়

তাহলে অন্যে তাকে শরবিদ্ধ করতে পারবে না ।

যা রোগিনী স্যাত্তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলত: ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ ।। (৯. ৮২)

এর বাঙলা অর্থ , স্ত্রী রুগ্না হয়েও যদি পতিব্রতা এবং শীলবতী হয় তবে তার অনুমতি নিয়ে স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারেন । কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর অবমাননা করবেন না । আমাদের প্রশ্ন এই অনুমতি নেওয়ার কি সার্থকতা ? স্ত্রী পতিব্রতা ও শীলবতী — সে রুগ্না এই তার অপরাধ । এ অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি চাওয়াই এক নিদারুণ অপমান । অনুমতি কে না দেয় ? মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখতে পাই অনুমতি না নিয়েই একাধিক বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে । ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভবানন্দ মজুমদারের দ্বিতীয়বার বিবাহের কাহিনী স্মরণীয় । রাজা দশরথ চারবিবাহ করতে গিয়ে কারও অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন বলে জানা যায় না ।

প্রজানার্থং স্ত্রিয়: সৃষ্টা: সন্তানার্থঞ্চ মানবা: ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্ম: শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিত: ।। (৯. ৯৬)

এই শ্লোকে তো নারী জাতির প্রতি চরম অসম্মান করেছেন মনু । স্ত্রীদের অস্তিত্ব কি শুধু সন্তান ধারনের জন্য ? তাহলে গর্ভাধানের জন্য কি পুরুষের সৃষ্টি ? মনুর সময় কেমন সমাজ ছিল জানিনা কিন্তু এই জাতীয় উক্তির বিরুদ্ধেই সর্বকালের নরনারীর একসাথে বিদ্রোহ করা উচিত।

।। তিন ।।

স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনের দ্বারা সাহিত্যিকেরা প্রভাবিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন সাহিত্যিকও রয়েছেন যারা মধ্যযুগের সমাজ শাসনকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। তারা স্মৃতিদুষ্ট দৃষ্টির দ্বারা নারী-দিগের প্রতি তাকাননি এবং তারা তাদের কল্পনার ও কবি প্রতিভার সদব্যব-হার করেছেন অন্যভাবে। তা নাহলে বেহুলার মত চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগে যে নারী চরিত্রগুলি আমরা পেয়েছি তারা হেয় জীবন যাপন করেছেন হয় সমাজব্যবস্থার দোষে না হয় রাষ্ট্র শক্তির ব্যর্থতার ফলে। নইলে শিক্ষার অভাবে তাদের যে দুর্দশা ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। লোরচন্দ্রানীকাব্যের মালিনী চরিত্র একটি সর্বাঙগ সুন্দর ও সার্থক কবি কল্পনা। প্রেমের ষড়যন্ত্রে এ নারীর ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই মালিনী কোন ন্যায়রত্নের টোলে শিক্ষা লাভ করেন নি। চন্ডী-মঙগল কাব্যের লহনা দুর্বলা দাসীর প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে তিল তিল করে খুল্লনার প্রতি নির্যাতন করেছেন, দুর্বলা দাসীকে ঔষধ করেও দিতে বলেছেন। এই দুর্বলা দাসী কোন শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করে শক্তি সঞ্চয় করেন নি।

সমাজ ব্যবস্থাপনার কথাই বলি। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন — ''নারীদের যৌনশুচিতা ও সতীত্বের আদর্শ স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট জোরের সঙেগই প্রচার করিয়াছেন এবং সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাহাই ছিল। তৎসত্ত্বেও বিত্তবান নাগর সমাজে তাহার ব্যতিক্রমও কম

ছিল না । আর পল্লীসমাজের যে স্তরে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ পুরাপুরি স্বীকৃত ছিল না , আদিম কৌমগত সামাজিক আদর্শ ছিল বলবত্তর , সে স্তরে যৌন জীবনের আদর্শই অন্য মাপের , রীতিনীতিও ছিল অন্যতর । হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শ দ্বারা তাহার বিচার চলিতে পারে না । ব্রাহ্মণ্য আদর্শ দ্বারা শাসিত সমাজেও অনিচ্ছায় , বলপূর্বক ধর্ষিতা নারী তখনকার দিনেও সমাজে পতিত বা সমাজচ্যুত বলিয়া গণ্য হইতেন না , বিধিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনু - ষ্ঠানেই তাঁহার শুদ্ধি হইয়া যাইত — এ সাক্ষ্য আমরা পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে।" (নীহার রঞ্জন রায় - বাঙালীর ইতিহাস - আদিপর্ব পৃ - ২৯৩)

রাষ্ট্রশক্তির ব্যর্থতার ফলে যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল বাঙলার সমাজ জীবনে তার পরিচয় মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গল কাব্য বা মনসামঙ্গল কাব্য কোনটাতেই তেমন চোখে পড়ে না ।

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত মলুয়া পালাটিতে তৎকালীন মুসলমান শাসক কুলের ও তাদের কর্মচারীদের নারীদেহ লোলুপতা অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে।

ঘরের বৌ টাইন্যা লইব
দেখিলে সেয়ানা
দারুণ দেওয়ান কাজী
না মানিব মানা ।। (পৃ - ১০১)

''দারুণ দেওয়ান কাজীদের '' ক্ষমতার কাছে পরাভূত হিন্দু কুলপতিরা দেওয়ান কাজীদের অসদাচরণের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করার মত শক্তি বা সামর্থ রাখতেন না বলেই তাদের সমস্ত আক্রোশ সমাজের দুর্বল অংশের

উপর গিয়ে বর্তেছে ।

এ-ছাড়া লোকসাহিত্য সৃষ্টির বহু পূর্বে চন্ডীমঙগল কাব্যেও এই ধরণের অত্যাচারের বিবরণ পাই । কবিকঙকণ মুকুন্দরাম নিজের জীবনে সেই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন । ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে তাঁকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে নির্বাসন দন্ড গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই উৎপীড়নের দাহ স্পর্শ করেছিল তাঁদের গৃহ জীবনকে । তাঁরা স্বামী - স্ত্রী উভয়েই দু:খ বরণ করেছিলেন । কিন্তু এমন কত অগণিত মুকুন্দরাম সেই আমলে পত্নীসহ , পরিবার পরিজন সহ পথে নেমে এসেছিলেন কে তার হিসাব রাখে ? এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সামাজিক বিশৃঙখলা যার জন্য মুকুন্দরাম বাস্তুভিটা ত্যাগ করেছিলেন তার কারণ মোঘল পাঠান সংঘর্ষ নয়, তা আসলে হুসেনশাহী বংশের সঙেগ সূরবংশের সংঘর্ষের সূচনা করেছে । কিন্তু একথা মেনে নেওয়াই ভালো যে সাধারণ ভাবে মধ্যযুগের কবি ও সাহিত্যিক এই রাষ্ট্র লাঞ্ছনা সম্পর্কে নীরব ।

তবু , এ কথা সত্যি যে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এদেশের মানুষ দীর্ঘকাল উৎপীড়িত হয়েছিলেন । সমাজে যদি উৎপীড়ন থাকে তবে সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটবেই । মনু , যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর যারই কথা স্মরণ করি না কেন তারা সংহিতা রচনা করেছিলেন সমাজ সংগঠনের একটা বিশেষ আদর্শ নিয়ে , সুতরাং সমাজ যে ভাবে চললে সকলের মঙগল হয় তাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল । সমাজে যা আছে তারই পুনরাবৃত্তি তাদের উদ্দেশ্য ছিল না । তাই যা হওয়া উচিত তারই অভিব্যক্তি এই স্মৃতি -

শাস্ত্রগুলো । মধ্যযুগে স্বাভাবিকভাবেই এবং সাধারণ কারনেই সমাজে আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না , সাধারণ নরনারীও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারতো না , আমরা জানি রাজনৈতিক অস্থিরতাই এর মূল কারণ । তুর্কী আক্রমনের পর প্রায় দু:শ বছর যাবৎ অর্থাৎ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতক এই অস্থিরতা বর্তমান ছিল , পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে (১৪৯৩) যখন হুসেন-শাহ্ বাঙলা দেশের শাসন ভার গ্রহণ করলেন তখন থেকেই সামাজিক জীবনের অস্থিরতা দূর হয়ে যায় । সর্বত্র শান্তি ও স্থিতির ভাব স্থায়ী হয় । তবুও সাধারণ ভাবেই একথা বলা চলে সমাজ জীবনে নৈতিক আদর্শ তেমন সবল ছিল না । বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই দুর্বলতার ভাবটি ধরা পড়েছে । জয়দেব যে সমাজের চিত্র এঁকেছিলেন তা দেখেও আমরা আশা - ন্বিত হই না , সে যুগের সাহিত্যে এমন কি পদাবলী সাহিত্যেও তার নিদর্শন আছে ।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখেই স্বীকার করে-ছেন যে রাধাকে ভোগ করবার জন্যই তিনি অবতার হয়ে এসেছেন — রাধা তখন এগার বৎসরের বালিকা মাত্র । বড়ু চন্ডীদাস দেখিয়েছেন এই বালিকাকেই ভোগ করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কত অনুরোধ , উপরোধ ও লাঞ্ছনা । কাব্যের দানখন্ডে যখন সেই সম্ভোগ বাসনা চরিতার্থ হলো সেই সম্ভোগের পর থেকেই রাধিকার মনেও পরিবর্তন ঘটেছে কবি এইভাবে দেখিয়েছেন । বাস্তব জীবনে একে ঠিক পেছনে লাগা বলে । কৃষ্ণ রাধিকার রোদে ছত্র ধারণ করেছেন , ভারখন্ডে তার দধির ভারও বহন করেছেন , শেষ পর্যন্ত এই সম্ভোগের মধ্য দিয়ে প্রেমের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে,

কাব্যের বংশীখন্ডে ও বিরহ অংশে এই হাহাকারের চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি । এই দুই অংশে রাধার চিত্র প্রেমিকারই চিত্র। পদাবলীর রাধিকা এইখান থেকেই যাত্রা করেছে । সমাজে নরনারী কেহই প্রেমের ব্যাপারে সুস্থ আদর্শের অনুসারী ছিল না বলেই আমরা মঙ্গলকাব্যেও এর ছাপ দেখতে পেয়েছি । কবি নারায়ণ দেবের '' মনসা পুরাণে '' গোদা এবং ধনামনা প্রভৃতি চরিত্র নারীদেহ ভোগলোলুপতার এক সুন্দর ও সার্থক উদাহরণ । আসল-কথা সমাজে দুর্নীতি ছিল , পাপপঙ্কিল চিত্রও ছিল । কিন্তু সমগ্রভাবে তা সমাজের পরিচয় বহন করে না । যে সমাজে বেহুলা চরিত্র চিত্রণের যোগ্য কবিও ছিলেন , পুরুষকারের সার্থক দৃষ্টান্ত চাঁদ সদাগরও ছিলেন । আমরা যেন ভুলে না যাই যে বাস্তববাদিতা কবির গুণ নয় , কল্পনার বলে বাস্তব-কে অতিক্রম করাই স্বভাব ।

স্মৃতিকারদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী সংগ্রহ করার ব্যাপার নিয়ে একটু বেশী মেতে উঠেছেন । তার সংহিতায় ''স্ত্রী সংগ্রহ প্রকরণম্ '' নামে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় যুক্ত হয়েছে । এই প্রকরণে কিভাবে নারীদের মন জয় করা যায় তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে -- পড়লে মনে হয় বাৎস্যায়ন রচিত ''কামসূত্র '' পড়ছি ।

পুমান্ সংগ্রহণে গ্রাহ্যঃ কেশাকেশি পরস্ত্রিয়া ।
সদ্যে বা কামজৈশ্চিহ্নৈঃ প্রতিপত্তৌ দ্বয়ো স্তথা ।।

—অর্থাৎ নারীদের মন জয় করতে হলে নানা প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে

হবে । প্রথমত: কেশে কেশে আকর্ষন করে খেলা , দ্বিতীয়ত: নারীদেহে কায়জ চিহ্ন উৎপাদন করা । এই কায়জ চিহ্ন অবশ্য অনুরাগ জনিত , নখক্ষত বা ব্রন ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে ।

নীবিস্তন প্রাবরণ সক্থিকেশাবমর্শননম্ ।
অদেশকাল সভাষং সহৈকাসনমেবচ ।।

—অর্থাৎ নারীদের চিত্ত জয় করার পথ অনেক — কখনো বা নীবি (মেয়েদের কোমরের কাছে পরিধেয় বস্ত্রের গিঁঠ বা বাঁধন), কখনো স্তন, কখনো বা পরিধেয় বস্ত্র , হাঁটু স্পর্শ করা, নির্জনে আলাপ এবং একই আসনে বসা প্রভৃতি উপায়ে নারীর মন জয় করা যেতে পারে । এই উপায়গুলি অবশ্য বাস্তব । কিন্তু বাস্তব জীবনে এই সব পন্থার প্রয়োগে নারী চিত্ত জয়ের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র । তবে যাজ্ঞবল্ক্য একদিকে প্রশংসার যোগ্য । কেননা দন্ডবিধানে মনু অপেক্ষাও কঠোর হতে পেরেছেন । তার বিহিত দন্ড এই — যদি পরদারাভিগমনে কেউ যদি অপরাধী হয় এবং সেই নারী যদি উৎকৃষ্ট বর্ণজাতা হয় তবে সেই অপরাধীর লিঙগচ্ছেদন পূর্বক বধ করা উচিত । এই দন্ডবিধানের উপর আমরা মন্তব্য করতে চাইনা । তবে আমাদের মনে হয় এই কঠোর দন্ড বিধানের ভয়ে এবং কতকটা সংস্কারের ভয়ে স্মৃতিশাসিত সমাজের কারো স্বাধীন চিন্তা ছিল না । তারা নির্বিচারে ঐসব বিধান মেনে চলাকেই পরমার্থ মনে করতো । স্মৃতিবিহিত দন্ডের মার খেয়েছে মানুষ , এবং এই মানুষেরই ছায়া অবলম্বনে শিল্পী তার ভাবপ্রতিমা গঠন করেছেন , কখনো বা বাস্তবকে অতিক্রম করে

কল্পনায় নতুন সৃষ্টি করেছেন । সমাজ মুগ্ধ হয়ে সেই কবির সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছেন । মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে বেহুলা , সতীময়না প্রভৃতি সেই ধরনের চরিত্র ।

হিন্দু সমাজ পরিচালিত হতো স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত ব্যবস্থা দিয়ে। এই আদর্শ সংরক্ষনে হিন্দুরা ছিল রক্ষনশীল । হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে ধর্মকে কেন্দ্র করেই এর সাহিত্য, সমাজ ও শিল্প গড়ে উঠেছে । এর অপর বৈশিষ্ট্য হল অতীতকে সরাসরি অস্বীকার না করা । অনেকটা রক্ষন - শীলতা হিন্দু সংস্কৃতির মূলে শেকড় গেড়ে বসে আছে । কিন্তু যুগে যুগে সমাজ জীবনে পরিবর্তন, কালের অমোঘগতির ফলে হতে বাধ্য । হিন্দুরা এই পরিবর্তনকে যথাসাধ্য অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মেনে নিয়েছে, অতীতকে নস্যাৎ করে নয় । কাব্যিক ভাষায় বলা চলে হিন্দু সংস্কৃতি যেন স্মৃতিবাহী চেতনার তরঙ্গ দোলনায় দুলে দুলে উত্থান - পতনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলে । মধ্যযুগে মনু , যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রামানিক স্মৃতিগ্রন্থের নতুন নতুন টীকা হয়েছে । বিভিন্ন অঞ্চলের স্মার্ত পন্ডিতগণ প্রাচীনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে নবীন জীবন বোধকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে - ছেন । বাঙলাদেশে এই কাজ করেছেন শূলপাণি , রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পন্ডিতগণ । কাজেই মধ্যযুগে বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ কি আদর্শে পরি - চালিত হয়েছিল তা এই সব সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় । অধিকাংশ পন্ডিতের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বাঙলাদেশে এইসব স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছিল ।

বাঙালী হিন্দু সমাজে বহু সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল । শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, কাপালিক, কৌল, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় ও মতের কমবেশি প্রভাব বাঙালী হিন্দুসমাজে স্পষ্টই ছিল । বহু দেবদেবীর বিভিন্ন মতে পূজা অর্চনা করা হত , নানা ব্রত পালন করা হত আর সেই সব দেবদেবীর উপর আরোপিত গুণাবলীর অনুসরণ করার প্রবণতা সমাজ জীবনে চালু ছিল ।

বঙগীয়স্মৃতিকারগণ নরনারীর যৌন সম্পর্ক স্হাপন ও পালন সম্পর্কে খুব সতর্ক ও সচেতন ছিলেন । এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সতর্ক । এই সতর্কতা দৃষ্টে অনুমান করা কঠিন নয় যে যৌন জীবন খুব শিথিল ছিল । এত শিথিল ছিল যে স্মৃতিকারেরা সেই শৈথিল্যকে চেয়েছেন বলগা লাগিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে । এরা মাতৃস্হানীয়া রূপে চিহ্নিত করেছেন মাতার সপত্নী, ভগ্নী, আচার্য্য-কন্যা, আচার্যানী এবং স্বীয় কন্যাকে । কোন অবস্হাতেই এই সব রমনীর সঙেগ পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্হাপন করা বিধেয় নয় বলে বিধান দিয়েছেন বঙ্গীয় স্মৃতিকারেরা ।

।।চার।।

যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য মনুর মত - ''ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'' - এ জাতীয় উদার ঘোষনা করেননি, তথাপি গৃহজীবনের প্রতি ধাপে অসংখ্য বিধানে নারী জীবনকে জর্জরিত করেছেন - প্রতিপদে অপরাধ এবং তার প্রায়শ্চিত্ত বিধান। উপবাস, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য ও আত্মপীড়ন এই যেন এই সব স্মৃতিকারদের নিকট ধর্মের ব্যাখ্যা। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত তৃষ্ণা-পীড়িত হয়ে যদি এক পাত্র বরফজল খেলাম তবে আমার ধর্ম নষ্ট হলো। জ্বরবিকারের রুগ্নশয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, ডাক্তার আমার প্রাণরক্ষার জন্যই যদি ঔষধের সঙ্গে পাঁচফোটা ব্র্যান্ডি মিশিয়ে দিলেন তবে আমার ধর্ম গেল। ধর্মোপার্জনের জন্য শুধু পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্মা লোভী কুকর্মাসক্ত ব্রাহ্মণদের দাও, - তুমি প্রাণ দিয়েও যে অর্থোপার্জন করেছো সেই ধন অপাত্রে ন্যস্ত করো - এই পথে ধর্ম রক্ষিত হবে। আমরা বাল্যকাল থেকেই একই ধর্মকে চিনতে শিখেছি - বস্তুত: ধর্মশিক্ষকরূপী স্মৃতিকারগণ যেভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তার মূর্তি অত্যন্ত ভয়ানক। এই সব বিধানের কুহকে পুরুষশাসন যেমন জর্জরিত হয়েছে - ততোধিক জর্জরিত হয়েছে স্ত্রীজাতি। কেননা এই নারী জাতির প্রতি ধর্মশিক্ষকগণ অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। মানুষ সুখী হওয়ার জন্যই সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। সুখের পরিমান বেশী হবে এই আশাতেই সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করে। মানুষ যে সব দু:খ অনুভব করে তারমধ্যে কতকগুলি আছে সামাজিক দু:খ, যেমন দরিদ্র,

সামাজিক দু:খগুলি চেষ্টা ও নিষ্ঠা থাকলে নিবারণ অসম্ভব নয়। তবে অনিবার্য দু:খ মাত্রায় কমান যেতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক তারও চিকিৎসা আছে, তারও যন্ত্রণা কমান যেতে পারে। কিন্তু সমাজের এই অনিবার্য দু:খের কারণ কি? কে মানুষের উপর অত্যাচার করে? পরস্পরের স্বার্থ বিধানের জন্যই যারা সমাজবদ্ধ হয়েছে তারাই পরস্পরকে উৎপীড়ন করে। ঠিক তাই বটে, অথচ ঠিক তা নয়। মনে রাখতে হবে যে শক্তিরই অত্যাচার - যার হাতে সামাজিক শক্তি সেই অত্যাচার করে। সমাজের শক্তি প্রধান শক্তি কেন্দ্র নিহিত। সেই শক্তি শাসন শক্তি। সমাজের শাসনকেন্দ্রে রয়েছেন রাজা বা সামাজিক শাসনকর্তাগণ - এরা রাজপুরুষ, অত্যাচারের পাত্র সমাজ। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণগণ রাজ - পুরুষ নন। অথচ তারাই সমাজের প্রধান শাসনকর্তা। তারা সমাজকে যেদিকে ফিরাতেন এবং ঘুরাতেন সমাজ সেই দিকেই ফিরতো এবং ঘুরতো। বাঙলার মধ্যযুগে সমাজের শাসক এই আর্যপুরোহিতগণতো ছিলেনই, তার সঙেগ ছিলেন স্মৃতিকারগণ এবং রাজপুরুষ।

আমাদের এইটুকু মনে রাখা দরকার তুর্কীশাসনের পর বাঙলাদেশ ছিল মোঘল ও পাঠান শক্তির অধীন। তারা কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী বাঙলাদেশ শাসন করতে পারতেন না, সুযোগ্য প্রতিনিধিকে পাঠাতেন শাসনকার্য নির্বাহ করার জন্য। এই প্রতিনিধিবর্গ মানুষ না হয়ে যদি অমানুষ হতেন তাহলে আর রক্ষা ছিল না। তারা এটুকু বুঝতেন বহু দূরবর্তী কেন্দ্রের রাজ - শক্তির নিকট তাদের কৈফিয়ত দেবার কিছুই নেই, কৈফিয়ত নেবারও কেউ

নেই । সুতরাং যা পার গুছিয়ে নাও । এই নীতির বশেই যারা স্বল্প - কালের জন্য রাজস্ব আদায়ের জন্য আসতেন তারা রাজস্ব আদায়ের ছলেই অগণিত কৃষককে ভূমিহীন করেছেন, অগণিত দরিদ্রকে বাস্তুহীন করেছেন । নিজের পকেট বোঝাই করাই তাদের একমাত্র পরমার্থ । আমাদের মঙ্গলকাব্য গুলিতে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই, বস্তুত: এদের অত্যাচারেই সমাজে দু:খের উৎপত্তি । মুষ্টিমেয় লোক কেবলমাত্র মুনাফার লোভে সমাজের অধিকাংশ লোকের উপরে অত্যাচার করে গেছে - সমাজের এই নজিরও মিলবে । ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সুবিচারের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

হীনজাতিং পরিক্ষীণম্ ঋণার্থং কর্মকারয়েৎ ।
ব্রাহ্মণস্তু পরিক্ষীণ: শনৈর্দাপ্যো যথোদয়ম্ ।।

(ঋণদান প্রকরণম — তৃতীয় অধ্যায়)

— অর্থাৎ ঋণগ্রহণকারী যদি হীন জাতি হয় তবে ঋণ শোধের জন্য তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে, অবশ্য ব্রাহ্মণ যদি ঋণী হন তিনি তার অর্থসঞ্চয় অনুযায়ী ধীরে ধীরে ঋণশোধ করতে পারবেন ।

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিপুত্রাস্তু বার্দ্ধকে ।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং ন স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিৎ স্ত্রিয়া: ।।

(বিবাহ প্রকরণে — শ্লোক নং ৬৪)

— বাল্যে কন্যাকে পিতাই দেখবেন, আর বার্দ্ধক্যে দেখবেন পতি এবং পুত্রগণ । এর অভাবে জ্ঞাতিগণ দেখবেন, মোটকথা স্ত্রীজাতি কোন অবস্থাতেই স্বাধীনভাবে চলতে পারবে না ।

মনু অবশ্য প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন — ''ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি''। যাজ্ঞবল্ক্য অন্যকথা প্রসঙ্গে বলে ফেললেন একই কথা। মনুসংহিতায় আমরা পেয়েছি স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হল তার কারণ তারা স্বভাবতই ব্যভিচারিনী।

পরাশরও মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতই ব্রাহ্মণের প্রশংসায় মুখর —

যুগে যুগে চ যে ধর্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্তব্যা যুগরূপা হিতে দ্বিজাঃ।।

— অর্থাৎ যুগে যুগে ধর্ম পরিবর্তিত হতে পারে, ব্রাহ্মণ ও স্বতন্ত্র হতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিন্দা কখনো করবে না, কেননা তারা সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ।

পরাশরের এই ব্রাহ্মণ ভক্তির আর একটি উদাহরণ —

পরাশরমতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
চিন্তিতং ব্রাহ্মণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ।। (৩৬)

এই অভিমত পুণ্য, পবিত্র এবং পাপ-বিমোচনকারী। পরাশর চিন্তা করেছেন ব্রাহ্মণদের জন্য এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য। সমস্ত পরাশর সংহিতা একমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্য এই মত কেউ না মানতেও পারেন। এই ব্রাহ্মণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, মনুসংহিতায় এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় অজস্র। তবে পরাশর নারীদের সম্পর্কে একটি বিধান দিয়েছেন তা

উল্লেখযোগ্য —

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ: ।
পঞ্চ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যে বিধীয়তে ।।

— স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছেন, স্বামী ক্লীব, স্বামী ধর্মে পতিত হয়েছেন — স্ত্রীর এই পাঁচপ্রকার সংকটে অন্যপতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শোনা যায়, এই শ্লোকটি থেকে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রবর্তনের প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু পরাশর অনেক পরবর্তী কালের লেখক। তাই তাঁকে নিয়ে কোন আলোচনা এই নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক হবে না।

।। পাঁচ ।।

আসলকথাটা সামন্ততন্ত্রবাদ নিয়ে। তার আলোচনা প্রয়োজন।

বাঙলাদেশ মোঘলের অধীনে আসে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে। মোঘল সম্রাট আকবর সে কাজটি সমাধা করেন। কিন্তু বহুদূরবর্তী বাঙলাদেশের রক্ষণাবেক্ষণ দিল্লীবাসী সম্রাটের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল বলেই তারা বাঙলা শাসনের জন্য প্রতিনিধি পাঠাতেন। এই প্রতিনিধিদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার প্রবল সুযোগ ছিল। তাঁরা রাজস্ব আদায়ের ছলে

প্রজাদের উপর এবং জনসাধারণর উপর অত্যাচার চালাতেন । ''বঙ্গদেশের কৃষক '' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম চন্দ্র এই সামন্ততন্ত্র কিভাবে বাঙলাদেশকে গ্রাস করেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা সুরুতেই উদধৃত হয়েছে ।

এ যেন অনেকটা দিল্লী সুলতান বা সম্রাট প্রেরিত শাসক প্রতিনিধির চিত্র । সম্রাট আকবর পাঠিয়েছিলেন তার সেনাপতি রাজা মানসিংহকে । কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে এরা রাজা হবেন তার কোন অর্থ নেই , দিল্লী প্রেরিত রাজকর্মচারীকেই রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হতো। তারা রাজ্যশাসন করতেন না , স্বার্থের বশে অত্যাচারী হয়ে উঠতেন । সামন্তনৃপতিদের দ্বারা রাজ্যশাসনের নীতিকেই ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র বলা হয়েছে । এই তন্ত্র শাসিত নীতি রাজ্যের পক্ষে বিভীষিকা মাত্র । সকল-ক্ষেত্রেই যে এই কর সংগ্রাহকগণ অত্যাচারী হতেন তার কোন যুক্তি নেই। তবে বাস্তব জীবন থেকে এই রীতি প্রজাপীড়নের একটা কৌশলমাত্র ।

রবীন্দ্রনাথ কোন এক প্রসঙ্গে বলেছেন -- ''আরম্ভের ও আরম্ভ আছে । যেমন সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালাবার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো ।'' পরবর্তীকালে মোঘল সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহের সাহায্যে অশান্ত বাঙলাদেশকে শান্ত করবার জন্য এবং শাসনকার্যে শৃংখলা স্থাপনের জন্য যে ভূস্বামী প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তারও আগে শেরশাহ এই দেশে এই প্রথার সূচনা করে গিয়েছিলেন । বাঙলাদেশকে

বলা হতো ''বিদ্রোহনগরী'' । এই নগরীকে শান্ত করতে গিয়ে তিনি দেশকে অনেকগুলি জায়গীরে ভাগ করে , প্রত্যেক ভাগের কর্তৃত্ব অর্পন করেছিলেন আফ - গান দলপতিদের উপর । এইভাবে বাঙলাদেশে জায়গীর প্রথার পত্তন হয়েছিল; এইভাবেই আমাদের দেশে ভূঁইয়াদের উৎপত্তি হয়েছিল । পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে নিহত করে আকবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন , তখন বাঙলার পাঠান শাসন ভেঙেগ পড়ছিল । হুসেনশাহী আমাল থেকে সুবাদার মান - সিংহের সময় পর্যন্ত বাঙলাদেশের সমাজ জীবনের কথা আলোচনা করলে কতকগুলি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হবে । পাঠান যুগে হুসেনশাহ হাবসী কুশাসন থেকে যখন বাঙলাকে রক্ষা করলেন তখন আপনার অজ্ঞাতসারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সমাধা করেছিলেন । হুসেনশাহ সর্বপ্রথম ক্ষমতাচ্যুত ভূমিহীন ওমরাহ ও হিন্দু অভিজাত সমাজকে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন । পরে অবশ্য মুঘল আক্রমনের পর এই আভিজাত্য ভাঙতে আরম্ভ করে । মুঘল শক্তির কাছে বাঙলার ভূঁইয়াগণ একে একে পরাজিত হলেন তাঁদের জমিদারী ও বিপুল ঐশ্বর্য মোঘল সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো ।

সাধারণ মানুষ নিয়েই সমাজ , তারাই ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রধান উপাদান । তারা শুধু যুদ্ধ বিগ্রহে কামানের খাদ্যই হয়নি । — দেশ, জাতি , সমাজ ও সংস্কৃতিকে নানা দিক দিয়ে পুষ্ট করেছে । শেরশাহ পরবর্তীকালে এই প্রথাকেই পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন । এরা মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সঙেগ সঙেগ সুবাদার মানসিংহ তাদের দমন করেছিলেন।

এই ভূস্বামীরা যাদের সাহায্যে কর আদায় করতেন তারা প্রায়ই উৎপীড়ক এবং স্বেচ্ছাচারী হতো। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলকাব্যে আমরা তার সামান্য পরিচয় পেয়েছি মাত্র। মনে রাখতে হবে, মোঘল আমলেই বাঙলাদেশে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম বৈশিষ্ট্য, দিল্লীর সঙ্গে বাঙলার যোগাযোগ স্থাপন, বাঙলা যে সর্বভারতীয় ঐক্যের অন্য - তম অংশ তা মোঘল আমলেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পাঠান আমলে মোঘল সুবাদারগণ কেউ বাঙলাদেশকে প্রীতির চোখে দেখতেন না, অনেকটা ইংরেজ রাজকর্মচারীর মতই এদেশে কিছুদিন চাকুরী করে প্রচুর ধনসম্পত্তি সহ দিল্লী আগ্রায় ফিরে গিয়ে ওমরাহ বনে যেতেন। বাঙলার সঙ্গে শাসন ছাড়া অন্য কোন মানসিক বা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল না। তবে মনে রাখতে হবে পাঠান আমলেই চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙলা সাহিত্য বিচিত্রভাবে বিকশিত হয়েছিল। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, মুকুন্দরাম এঁরা পাঠান আমলের প্রভাবেই বর্দ্ধিত হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই পাঠান আমলের ইতিহাসকে বাঙলাদেশের ইতিহাস বলেই স্বীকার করেননি এই মন্তব্যের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা বোধ হয় সঙ্গত হবে না। ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় বার বৎসর একাধিক বার বাঙলায় সুবেদারী করে মানসিংহ দেশে মুঘলরাজশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার শক্তি ও বুদ্ধি বলে বিদ্রোহী ভুঁইয়ারা হতবল হয়েছিলেন, কেউ বা নিহত হয়েছিলেন, এইভাবে মানসিংহের বিচক্ষণতায় বাঙলায় মুঘল শক্তির বিপদ কেটে গেল। অর্থাৎ মানসিংহ বাঙলাদেশকে মুঘলশক্তির ছায়াতলে আনতে সাহায্য করে এদেশে একটা

দীর্ঘস্থায়ী শাসনব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। অবশ্য, শেরশাহের আমলেই বাঙলা কতকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছিল এবং প্রতি-খণ্ডে একজন করে আমীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, প্রাক্‌মোঘল যুগের পাঠান শাসকদের ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার প্রকৃত ইতিহাস বলে স্বীকার করেন নি। ষোড়শ শতকে মোঘল শাসন স্থাপিত হয়েছিল - এর পূর্ববর্তী পাঠান শাসন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি যুক্তিহীন নয়। এই যুগ সম্পর্কে মুসলমান ঐতিহাসিক-গণ অর্থাৎ তবাকৎ - ই - নাসিরী, রিয়াজ - উস - সালা - তিন, আইন-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিস্তার লেখকগণ যে বৃত্তান্ত রেখে গেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'অপদার্থ' পাঠান শাসকগণের 'খিচুরি-ভোজনের' ইতিহাস মাত্র। বর্বর শক্তির নির্মম আঘাতে বাঙালীর তখন চৈতন্য ছিল না। পাঠান, খিলজী, বলবন, মামলুক ও হাবসী সুল-তানদের চণ্ডনীতি ও রক্তাক্ত সংঘর্ষে বাঙালী কোন রকমে আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিল। তার সামাজিক দেহটাতেই ইসলামের প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল এর ফলে ১৩শ-১৫শ শতকে বাঙালীর সাহিত্যিক প্রতিভা কিছু পরিমানে ক্ষুন্ন হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই - তবে কিছু স্মৃতিশাস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব স্মৃতিকারের মধ্যে শূলপানি (পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগ) শ্রীকর আচার্য্য (পঞ্চদশ শতকের চতুর্থ দশক), আচার্য চূড়ামণি (পঞ্চদশ শতকের শেষদশক) উল্লেখযোগ্য। এঁরা নিয়মের বাঁধ দিয়ে বিধ্বস্ত প্রায় হিন্দুসমাজকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। কবির ভাষায় —

এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে ।

তৃষ্ণা মিটেছিল কিনা জানিনা — তবে একদিকে ব্রাহ্মণের নির্ভেজাল স্তুতি , অন্যদিকে নারী বিদ্বেষ ও শূদ্রনিন্দার অপপ্রচেষ্টার কামনা যে তৃপ্ত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই ।

হাবসী শাসন (১৪৮৭ — ১৪৯৩ খ্রী: অ:)

এই হাবসী খোজার দল প্রায় ছয় বছর ধরে বাঙলাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছিল । এদের রাজত্ব শুধু রক্তপাত ও হত্যার ইতিহাস । হাবসী শাসনের স্বল্পকালের ইতিহাসের শেষভাগে বাঙলার সুলতান ছিলেন মুজাফ্ফর শাহ্ , এর মত নীচ চরিত্র , রক্ত পিপাসু নরপিশাচ সুলতান বাঙলার ইতিহাসে দুর্লভ ।

এর আগে আমরা পাঠান শাসনের কালকে (১২০৬ — ১৪৯৩ খ্রী:অ:) কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে প্রথম ভাগের নাম দিয়েছিলাম আমীর ওমরাহের অধীনে বাঙলা (১২০৬ — ১২২৭ খ্রী: অ:) — এরপর অবশ্য বাঙলা চলে গিয়েছিল দিল্লীর সুলতানের অধীনে । এই আমীর ওমরাহরাই সামন্ত - তান্ত্রিক শাসনযন্ত্র অধিকার ক'রে ইচ্ছেমত আমীর ওমরাহকে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়েছেন এবং নামিয়েছেন ।

মুজাফ্ফর সুলতান হয়েই ওমরাহ সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করলেন, অভিজাত বংশীয়দের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলেন, তিনি চড়াহারে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করলেন, সেনাবাহিনীর বেতন কমিয়ে দিলেন। পরে তার মন্ত্রী সৈয়দহুসেন পাইকদের সাহায্যে তাকে হত্যা করিয়ে হাবসী শাসনের দুর্ভাগ্য থেকে দেশকে রক্ষা করেন।

হুসেনশাহ্ সুলতান হয়ে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।

দীর্ঘ আলোচনার মধ্যদিয়ে এই তথ্যটুকু অন্তত: স্বচ্ছ হবার কথা যে দেশে সুদৃঢ় এবং সর্বগ্রাসী কেন্দ্রীয় শক্তির পরিবর্তে স্বয়ং সম্পূর্ণ সামন্তশ্রেনীর উদ্ভব হয়েছিল। এরা সরকারকে কোন রাজস্ব দিতেন না, সুলতানের প্রয়োজন হলে এরা বাধ্য থাকতেন শুধু সেনাসাহায্য করতে।

ফলে এরা যাদের সাহায্যে কর সংগ্রহ করতেন — তারা মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতেন। এই কর সংগ্রাহকগণ শুধু রাজস্ব সংগ্রহ করতেন না — নারী সংগ্রহ ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য, তাছাড়া ধর্ষন, লুণ্ঠন, প্রহার এসবতো ছিলই।

ধর্ষনের পর লুণ্ঠিত নারীদলকে পণ্যের মত বিক্রী ক'রে অন্যদেশে চালান দিতো - এটা তাদের ব্যক্তিগত মুনাফা।

এই নারী ধর্ষনের কি শাস্তি বা কি প্রায়শ্চিত্ত কোন স্মৃতির বিধানেই তা লেখা নেই। তবু সমাজ কর্তাদের বিধান — 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' স্ত্রী জাতি স্বাধীনতার যোগ্য নয় — আর সেই সঙেগই নারীস্তুতি - 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতা:'— 'যেখানে নারীগণ পূজিত হন সেইখানেই দেবতার অধিষ্ঠান'। ভাবের ঘরে চুরি তো একেই বলে।

এই সামাজিক পটভূমিকায় বাঙলা সাহিত্যের যে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল তাতে স্বাভাবিভাবেই তৎকালীন সমাজে গার্হস্থ্য দাম্পত্য ও নর - নারীর ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়েই সে সাহিত্য সীমিত ছিল। রাজন্যবর্গ ও শাসককুলের অত্যাচার ও নিপীড়ন সম্পর্কে পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল কবিগণ কোথাও কোথাও ব্যঙ্গস্তুতির মধ্যে দিয়ে তাদের চরিত্র প্রস্ফুটিত করার চেষ্টা করলেও তা ছিল অত্যন্ত সীমিত। তাছাড়াও এই ধরণের সাহিত্যে কেবল দরবারী জীবনই অঙ্কিত হয়নি সাধারণ নরনারীর চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। নারী সে সমাজে ভোগের সামগ্রী, ব্যবসায়ের পণ্য, উচ্চাকাঙখা পূরণের উপঢৌকন, বিজেতার প্রণামী ও গৃহের মর্যাদাহীন দেহ - সর্বস্বা দাসী।

কবিকঙকন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙগল কাব্য সমগ্র মঙগলকাব্য সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে। চন্ডীপূজার প্রচারই এই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য — এই কাব্যে নারীর অমর্যাদাসূচক একটি উক্তি আছে — ''স্ত্রীলিঙগ দেবতা আমি পূজা নাহি করি''। এই একটি উক্তি

সমগ্রকাব্যে নারীর স্থান নির্দেশ করছে। এই একটি মন্তব্যেই রয়েছে মধ্য-যুগের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন।

সমাজ ব্যবস্থা এই। পতিকে ছেড়ে একদিন অন্যত্র বসবাস করলে নারীর যে পাপ হয় তার শাস্তি অমানুষিক -- তার জন্য তাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু একটি পুরুষ তার সতীসাধ্বী সমর্পিত প্রাণা স্ত্রীর চোখের জল ও সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা করে অন্যনারীর প্রতি যদি আসক্ত হয় তারজন্য পুরুষের কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই।

মঙ্গলকাব্যসমূহে সুন্দর পুরুষকে দেখামাত্র একদল নারী স্ব স্ব স্বামীর রকমারি দোষের পাঁচালী গাইবে এবং নিজপতি নিন্দা করে কল্পনায় সেই সুন্দর পুরুষটিকে পতিরূপে পেতে চাইবে এমন বর্ণনা দেখা যায়। যেন নারীর একমাত্র চাহিদা, পুরুষ তাকে উপভোগ করুক।

আখ্যানকাব্য ---- নরনারীর প্রণয়কে উপলক্ষ্য করে মধ্যযুগে কয়েকটি আখ্যানকাব্যও গড়ে উঠেছিল। সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী এই ধারারই একটি বিখ্যাত কাব্য। কবি দৌলতকাজী ছিলেন মধ্যযুগীয় এবং একাব্যের পৃষ্টপোষকতা করতেন রাজা বাদশারা। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ময়না-মতীর মত আর্তদীর্ঘশ্বাসে মধ্যযুগের আকাশ বাতাস ব্যথাতুর হয়ে আছে। কাব্যটি দৌলতকাজীর রচনা।

তখন বল্লালসেনের কৌলীন্যপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে -- তাই মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখতে পাই বহুনায়ক একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। প্রথমা স্ত্রীর অনুভূতিকে দলিত ক'রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা। লোরচন্দ্রানী বা সতীময়না কাব্যে নায়ক লোর তার স্ত্রী ময়নাকে নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ ক'রে রূপবতী চন্দ্রানীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অবতাররূপে মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেবার পর অনেক দেবতাও পার্থিব বিচারে কুলীন না হয়েও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। ফলে পার্থিব নায়িকারাই দুঃখভোগ করেছিলেন।

ভোগ্যপণ্য দ্রব্যবিশেষের মত অপছন্দ নারীকে ত্যাগ করে একজন শক্তিমান পুরুষ পছন্দমত অন্য এক নারীর স্বামীকে হত্যা করে তাকে নিজের ভোগের জন্য নিয়ে গেছেন এবং আনন্দে দিনযাপন করছেন। এই চিত্রে স্বৈরাচারী শক্তির স্বেচ্ছাচারিতা প্রকটিত হয়েছে। মধ্যযুগের সামন্তচক্র এবং তাদের লোভ লালসার কথা মনে রাখলে এ কাব্যের নায়ক সম্পর্কে আর কোন মোহ থাকে না।

ময়মনসিংহ গীতিকার 'জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী' পালায় আমরা অনুরূপ চিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। বিরহজ্বালা সইতে না পেরে চন্দ্রাবতী মন্দিরে দেব-আরাধনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। পিতা পুনরায় বিবাহের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন কিন্তু কন্যা পিতাকে বলেছিল --''বিয়ে থাক্, আমার জন্য একটা মন্দির করে দাও, মন্দিরে

দেবতার আরাধনায় আমার জীবন কেটে যাবে''। গতানুগতিক চরিত্র হলেও দুই চরিত্রের পৃথক পরিণতি।

সামন্ত শাসিত সমাজে নারীজাতির যথার্থ রূপটি কি ? সহজ কথায় নারীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ও কোন পৃথক মূল্য ছিল না — পুরুষদের খেয়ালের উপরই তাদের জীবন নির্ভর করতো। নারীর মানবিক সত্তাকে সমাজ যেমন মেনে নিতে পারেনি — কবিগণও তা দিতে পারেনি।

তখন নারীজাতির যেমন মূল্য ছিল না, দ্রব্যাদিরও মূল্য ছিল না —অর্থাৎ দ্রব্যাদি খুব সস্তা ছিল। তা হলেও সাধারণ কৃষক ও প্রজাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। তার প্রধান কারণ — রাজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন। চন্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দামুন্যায় ছয় সাত পুরুষ যাবৎ অধিবাসী — তার জীবিকার অবলম্বন ছিল কৃষি। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে যখন তিনি পৈতৃক ভিটা ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হলেন তখন তিনদিন ভিক্ষান্নে জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হল যে —

তৈল বিনা কৈল স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের ত'রে।

কবিকঙ্কনের চন্ডীতে সতীনের কোপে খুল্লনার কষ্ট ও ফুল্লরার বার মাসের দুঃখের বর্ণনায় এই দারিদ্র দুঃখ প্রতিফলিত হয়েছে।

শাসনকর্তার অত্যাচারে স্বচ্ছল গৃহস্থের কিরূপ দুর্দশা হতো , তার বর্ণনা পাই মানিকচন্দ্র রাজার গানে —

ভাটি হইতে আইল বাঙাল লম্বা লম্বা দাড়ি ।
সেই বাঙাল আসিয়া মুল্লুক কৈল বাড়ি ।।
আছিল দেড়বুড়ি খাজনা, লইল পনেরো গণ্ডা ।
লাঙল বেচায়, জোয়াল বেচায়, আরো বেচায় কাস ।।
খাজনার ওপেতে বেচায় দুধের ছাওয়াল ।
রাঢ়ী কাঙাল দু:খীর বড় দু:খ হইল ।
খানে খানে তালুক সব ছত্র হইয়া গেল ।।

বিদেশী পর্যটক মানরিক লিখেছেন — ''খাজনার টাকা না দিতে পারলে হিন্দুদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিলামে বিক্রয় করা হতো । কর্মচারীরা কৃষকদের নারীধর্ষণ করতো এবং পিয়াদারা নানা প্রকার উৎপীড়ন করতো — এর কোন প্রতিকার ছিল না । সাধারণ লোকের দুর্দশার আর একটি কারণ যুদ্ধের সময় সৈন্যদের লুটপাট । যুদ্ধের বিরতির পরেও বিজয়ী সৈন্যেরা লুটপাট করতো । দুই পক্ষের সৈন্যেরাই লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ প্রভৃতিতে এত অভ্যস্ত ছিল যে সৈন্যেরা আগমন বার্তা শুনলেই রাস্তায় দুই পাশের গ্রাম ছেড়ে লোকে দূরে পালিয়ে যেত''।

ইতিহাস বলে , সামন্ততন্ত্রের শাসনে নারী মুসলমান কর্মচারী ও পাইকের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল । ইতিহাস মিথ্যে বলে না ।

কিন্তু কোন্ উচ্চতর আদালতের রায় শুনে সমাজের শিল্পী ও কবিরা সিদ্ধান্ত করলেন নারীজাতি আসলে ''পুংশ্চলী'', পুরুষ দেখলেই তাদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে ?

নস্যি নাকে নিয়ে স্মৃতিকারগণ সমর্থন জানালেন ঠিক কথা, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' । ওদের একটু সতর্ক প্রহরার মধ্যে রাখতে হবে । ধর্ষিতা নারীদের দেখে স্মৃতিকারদের এই সাধারণ উক্তি অযৌক্তিক । সমাজে এই ধরণের নারী ছিল বলেই কবি তার কাব্যে অনুরূপ চরিত্র অঙ্কিত করে-ছেন আর স্মৃতিকার ঐ সতর্কবানী শুনিয়েছেন — একথা ভিত্তিহীন । মধ্য-যুগের সাহিত্য থাক - আমাদের দুই মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারতেও আমরা নারীর এই লাঞ্ছিত রূপ দেখতে পাই । সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র দীর্ঘকাল সীতার লঙ্কাবাসহেতু লোকাপবাদের কথা তুলে সীতাকে ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেছেন । এর আগেই দু:খিনী সীতার অগ্নি পরীক্ষা হয়ে গেছে — স্মৃতিকার তুচ্ছ, স্বয়ং অগ্নিদেব সীতাকে রাম-চন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে বলেছেন, সীতা নিষ্পাপ । তবু সীতা বিসর্জিতা হলেন -- তিনি তখন আসন্ন প্রসবা । অশ্রু, যুক্তি সব কিছুই ভেসে গেল প্রজানুরঞ্জনের দাবীতে । পরে অবশ্য এই সীতাকেই তিনি সাধারণ মানুষের অপবাদকে বড় মনে করে নিয়ে পাতাল প্রবেশে বাধ্য করেছিলেন — যে সীতা তাঁরই ঔরসজাত সন্তান লবকুশের জননী — যে সীতার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন স্বয়ং ঋষিকবি বাল্মীকি । এ তো নিরাপরাধা নারীর লাঞ্ছনা । এই নারী বিদ্বেষের বীজ পুরুষ চরিত্রের

মধ্যেই ।

মহাভারতেও এই জাতীয় নিগৃহীতার অনুরূপ চরিত্র মিলবে । দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে গিয়ে আশ্রম বালিকা শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হলেন — দুর্জনের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহ হয়ে গেল — পরে গর্ভবতী শকুন্তলা রাজসভায় এসে লাঞ্ছিতা হলেন, প্রত্যাখ্যাতা হলেন, দুষ্মন্ত তাকে চিনতেই পারলেন না । শুধু তাই নয়, এই অসহায়া রমনীকে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় তির - স্কার করলেন —

বেশ্যাগর্ভে জন্ম তোর বেশ্যার প্রকৃতি
এই পুত্র সেই মত সহে মোর মতি ।

মহাভারতে দ্রৌপদীর কথাও তোলা যেতে পারে । নিজেকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় হেরে গেলেন তারপর তিনি হেরে গেলেন দ্রৌপদীকে পণ রেখে । নারী যেন একটা প্রাণহীন সম্পত্তিমাত্র । তাকে বাজি ধরে পাশা খেলা যায় । এক মুহূর্তে দ্রৌপদী হয়ে গেলেন কৌরব- দের ভোগ্যা — তাকে নিয়ে আসা হল সভাকক্ষে — কামলোলুপ কৌরব - দের আকর্ষণে দ্রৌপদী, তখন প্রায় বিবস্ত্রা সেই দৃশ্য সভ্যজনের অদর্শনীয়, আমরাও সরে এলাম । এলাম সেই মধ্যযুগের সামন্তশাসিত সমাজ ব্যবস্থায়।

আগেই বলেছি, রাজস্ব আদায়কারীরা লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণের কাজে বেশ পারদর্শী ছিল । জনৈক বিজয়ী মুঘল সেনানায়কের বিবৃতি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি —'' এরা নগর ও জনপদ লুটপাট করতো, আগুন লাগিয়ে

ধ্বংস করতো , স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করতো এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ ও বহু নরনারীকে হরণ করে পশুর মত নৌকার খোলে বোঝাই করে নিয়ে দাসরূপে বিক্রয় করতো । মোটের উপর মধ্যযুগে সাধারণ লোকের অবস্থা খুব ভালো ছিল এরূপ মনে করবার কোন কারণ নেই''।

হিন্দু সংস্কৃতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । প্রথমত: এই সংস্কৃতি ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে , দ্বিতীয়ত: প্রাচীন যুগের সঙ্গে এই সংস্কৃতি যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে , ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,— ''মধ্যযুগের স্মৃতি নিবন্ধাদিতে (মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি) যে সকল বিধি - নিষেধ আছে উহাদের কতটুকু প্রাচীনতর শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি মাত্র এবং কতটুকু তদানীন্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি তাহা নির্ণয় করা দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব''। তা যদি সত্য হয় , তবে স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তাকে তৎকালীন ছবি বলে ভুল করা চলবে না । স্মৃতিকারেরা বিধান নির্দেশ ব্যাপারে মোটামুটি গতানুগতিক ধারাকেই অনুসরণ করে চলেছেন — এবং যা আছে তা না বলে প্রধানত: যা হওয়া উচিত তারই নির্দেশ দিয়েছেন। মধ্যযুগের অধিকাংশ স্মৃতিকার বল্লালসেনের (দ্বাদশ শতক) পরবর্তী । বল্লালসেনের প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথা তখন সমাজে দৃঢ়মূল । কুলীন ব্রাহ্মণ চরিত্রগত অপদার্থ বিবেচিত হলেও শুধু কৌলিন্যের গুণেই তার বহুবিবাহের অধিকার ।

।। ছয় ।।

মনু আটপ্রকার বিবাহের কথা বলেছেন — ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ । পৈশাচ বিবাহ মনুর মতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । পৈশাচ বিবাহ হচ্ছে :-

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি ।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধম: ।।(৩.৩৪)

নিদ্রিতা সুরাপানে বিহ্বলা বা উন্মত্তা নারীর সঙ্গে নির্জনে সঙ্গত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ । স্মৃতিকারের ঘোষণা, আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ অত্যন্ত পাপজনক এবং অধম । এই কারণেই মনু শুধু পৈশাচ বিবাহ নয় — তার সঙ্গে আসুর গান্ধর্ব, রাক্ষস বিবাহ বর্জন করতে বলেছেন । যুক্তি দিয়েছেন, এ জাতীয় বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে তারা ক্রূরকর্মা, মিথ্যাবাদী, ধর্ম ও বেদ বিদ্বেষী হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু পুরাণ একথা সমর্থন করে না । দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব বিবাহে গ্রহণ করেছিলেন — তাদের পুত্র ভরত , অর্জুন চিত্রাঙ্গদার বিবাহকেও গান্ধর্ব বিবাহ বলা যেতে পারে তাদের পুত্র বীরবভ্রুবাহন , শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে বিবাহ করেছিলেন — তাদের প্রথম সন্তানের নাম প্রদ্যুম্ন , এই বিবাহ 'আসুর বিবাহ' ছাড়া আর কি? মনু অসবর্ণে বিবাহও সমর্থন করেছেন —

২. পাণিগ্রহণসংস্কার: সবর্ণাসূপদিশ্যতে ।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্মণি ।। (৩.৪৩)

শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ উপদিষ্ট হয়েছে । স্ত্রী যদি অসবর্ণা হয় তবে পাণিগ্রহণের পরিবর্তে নিম্নলিখিত বিধি পালনীয় —

এই বলেই মনু পালনীয় বিধির নির্দেশ দিয়েছেন —

৩. শর: ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্য: প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া ।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে ।। (৩.৪৪)

যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করবেন তখন ক্ষত্রিয়া কন্যা ব্রাহ্মণের পাণিগ্রহণ না করে হস্তধৃত শর গ্রহণ করবে । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা কন্যাকে বিবাহ করলে বৈশ্যা বরহস্তধৃত দন্ড (অশ্বাদি তাড়াবার দন্ড-প্রতোদ) , ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রাকন্যাকে বিবাহ করলে শূদ্রা কন্যা বরের পরিহিত বস্ত্রের প্রান্তভাগ (দশা) গ্রহণ করবে ।

মনুর বিধান এই শ্লোকটিতে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে মনে হয় । স্মৃতিকার অনায়াসে বলতে পারতেন — সবর্ণা স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ শাস্ত্রসম্মত । আলোচ্য শ্লোকে মনুর বক্তব্য — অসবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করতে পারি, তবে তাকে পাণিগ্রহণ বলা যাবে না — কোথাও আঁচলের খুঁট , কোথাও দন্ড , কোথাও বা বসনের প্রান্তভাগ— এসব গ্রহণ করলেই চলবে । অথচ অসবর্ণ বিবাহ মনু সমর্থন করেছেন । আঁটুনি এত বজ্রকঠিন করতে গিয়েই গেঁরোটা হাল্কা হয়ে গিয়েছে ।

কিন্তু প্রশ্ন এই, অসবর্ণ বিবাহে কি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয় না ? মনুতো দ্বিতীয় সর্গসহ পূর্ববর্তী শ্লোকে (দ্রষ্টব্য ৬৭ নং শ্লোক) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন — জাতকর্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠান স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও অবশ্য করণীয় - তবে সেই অনুষ্ঠানগুলি হবে 'অমন্ত্রক ' অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্র সেই সব অনুষ্ঠানে উচ্চারিত হবে না । কিন্তু স্ত্রীলোকের বিবাহে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত বৈবাহিকো বিধি: স্ত্রীনাং সংস্কারো বৈদিকো স্মৃত: ।

শ্রী জীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত মনুসংহিতা গ্রন্থে সম্পাদক লিখেছেন — "নারীর পক্ষে পুরুষের সমান দাবীর কথাটা যুক্তিহীন — আধুনিক নরনারীর সাম্যবাদ স্বাভাবিক নহে (।) — ইহা একটা অভিমানিক কৃত্রিম মতবিন্যাস-মাত্র ।'' ন্যায়তীর্থ পন্ডিতের বিধান, নিশ্চয়ই এতে অন্যায় কিছু থাকতে পারে না ।

মনুর নারীবিদ্বেষ কিরূপ উৎকট ছিল — মনুসংহিতা থেকে যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটি শ্লোক উদধৃত ক'রে তার প্রমাণ দিচ্ছি ।

১. দূরস্থো নার্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নাস্তিকে স্ত্রিয়া: ।।
যানাসনস্থশ্চৈবৈনমবরুহ্যাভিবাদয়েৎ ।। (২.২০২)

শিষ্য নিজে যেতে অসমর্থ হলে অন্যকারও হাতে মাল্যচন্দন পাঠিয়ে গুরুর অর্চনা করবেন , স্ত্রীলোকের নিকটে গুরু অবস্থিত থাকলে তাঁর অর্চনা

করবে না । শিষ্য যানে বা আসনে উপবিষ্ট থাকলে যান থেকে অবতরণ করে বা আসন থেকে উঠে গুরুকে অভিবাদন জানাবে ।

স্ত্রীলোকের নিকটে গুরু অবস্থিত থাকলে - কথাটা লক্ষ্যনীয় ।

২- যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাং সং ন প্রমোদয়েৎ ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে ।। (৩.৬১)

বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত না থাকলে স্ত্রী স্বামীর প্রীতি জন্মাতে পারেন না , আবার স্ত্রী স্বামীর প্রীতি জন্মাতে না পারলেও সন্তানোৎপাদন হয় না ।

মনুর উক্তি হলেও সংশয়াতীত নয় । বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত ক'রে স্ত্রীকে সম্মান করা — সে তো স্বামীর কর্তব্য । তার সঙ্গে সন্তানোৎপাদনের কি সম্পর্ক বোঝা গেল না । দেখা গেছে বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত না হয়েও স্ত্রী স্বামীর প্রীতিভাজন হয়ে থাকেন , (কেননা, স্বামীর প্রীতি কেবলমাত্র বস্ত্র ও অলঙ্কারের উপর নির্ভর করে না ।) তাছাড়া, স্ত্রী স্বামীর প্রীতিভাজন না হয়েও বছরের পর বছর সন্তানের জন্ম হয়ে যাচ্ছে - কোন বাধাই হচ্ছে না ।

৩. স্বাভাব এব নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্ ।
অতোঽর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ ।। (২.২১৩)

ইহলোকে পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব । সুতরাং পণ্ডিত-গণ নারী সম্পর্কে কখনও অসতর্ক হন না । খুবই চিন্তার কথা । কিন্তু এ জাতীয় পণ্ডিতের সংখ্যা কত ? বহু পণ্ডিত বিবাহ করেছেন এবং তাদের বিবাহিত জীবনও সুখের ।

৪. নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীম্ ।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা ন চাসীনাং যথাসুখম্ ।। (৪.৪৩)

৪১ নং শ্লোকে মনু রজস্বলা স্ত্রী সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে-ছেন । মনুর মতে ঋতুমতী হওয়া কি অপরাধ ? আলোচ্য শ্লোকে বলা হয়েছে, ঋতুমতী ভার্য্যার সঙ্গে স্বামী একসঙ্গে ভোজন করবেন না । অথবা ভার্য্যার ভোজন সময়ে তাকে দেখবেন না । ভার্য্যার হাঁচবার সময়, হাইতোলার সময় কিংবা সে যখন ইচ্ছামত অসংযতভাবে সুখে অবস্থান করবে তখনও তাকে দেখবেন না ।

ক্ষতি কি? দ্রষ্টা তো স্বামী, দৃষ্টা বিবাহিতা স্ত্রী— দেখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না । তাছাড়া স্ত্রী কখন হাঁচবেন বা হাই তুলবেন স্বামী কি ভাবে তা জানবেন ? এখানে স্বামীকে না বলে স্ত্রীকে বলা-ই সঙ্গত — গুরুজনের সামনে হাঁচবেন না বা হাই তুলবেন না । আমাদের মেয়েরা মনু না পড়েই এই নিয়ম পালন ক'রে থাকে । তারা হাঁচে না, উচ্চকণ্ঠে কথা বলে না, শব্দ ক'রে হাসে না — এমনি অনেক কিছুই করে না যা অসৌজন্যের পরিচায়ক ।

৫. পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্ বিরহমাত্মনঃ ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে ।। (৫.১৪৯)

পিতা, স্বামী, বা পুত্রের সঙ্গে নারী কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকতে ইচ্ছে করবেন না , কারণ এদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকলে তিনি পিতৃ-কুল ও পতিকুল , উভয় কুলই কলঙ্কিত করবেন ।

মনুর মতে নারীকে কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয় । এইজন্য তিনি তার চিরজীবনের অভিভাবক স্থির করে' দিয়েছেন ।

টীকাকার কুল্লকভট্ট জানাচ্ছেন —'' ভর্ত্তরি মৃতে পুত্রানাং, তদভাবে তৎ সপিণ্ডেষু , তেষু চ অসৎসু পিতৃপক্ষঃ স্ত্রিয়ঃ , পক্ষদ্বয়াবসানে রাজা ভর্ত্তা প্রিয়ঃ স্মৃতঃ''— শেষ পর্যন্ত রাজার জিম্মায় রাখা হবে নারীকে। ব্যবস্থার কোন ত্রুটিই নেই ।

আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই । এতেই নারী সম্পর্কে মনুর মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়বে । এই বিদ্বেষের হেতু কি তা জানবার অবকাশ আমাদের নেই , প্রয়োজনও নেই , কিন্তু এর ফলে প্রায়শ্চিত্ত বিধানে, কি দণ্ড বিধানে সর্বত্র সুবিচার হয়নি — দেখা যাচ্ছে, নারী প্রসঙ্গ এলেই মনু বিষোদ্গার করেছেন ।

যাজ্ঞবল্ক্যের নারী স্তুতিও একই সুরে সাধা । দ' একটি উদাহরণ

পরীক্ষা করা যেতে পারে —

১- সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধার্থঘ্ন্য প্রিয়ংবদা ।
স্ত্রী প্রসূত্যধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিনী তথা ।।

(বিবাহ প্রকরণম্ ৩.৭২)

যে কন্যা সুরাপান করে না, (পততৎদর্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং-পিবেৎ ইতি সামান্যেন নিষেধাৎ) যে কন্যা দীর্ঘরোগগ্রস্হা , নিষ্ফলা , ধূর্ত্তা , নিষ্ঠুরবাদিনী নয় — এমন কন্যাকেই পুরুষ স্ত্রীরূপে নির্বাচিত করবেন । কিন্তু কোন কন্যা সুরাপান করে কিনা , দীর্ঘরোগগ্রস্ত কিনা , ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা বা অপ্রিয়ভাষিনী কিনা — এই সব তথ্য বিবাহের পূর্বে জানা যাবে কি উপায়ে ? সবই তো ক্রমশ: জ্ঞাতব্য । এত বিস্তৃত ব্যক্তিগত তথ্য বিবাহের পূর্বে জানা কি সম্ভব ?

২. বিদ্যাতপোভ্যাংহীনেন ন তু গ্রাহ্য: প্রতিগ্রহম্
গৃহ্ণনং প্রদাতারস্বধো নয়ত্যাত্মানমেবচ ।।

যে কন্যা বিদ্যা ও তপস্যায় হীনা তাকে বিবাহ করার অবকাশ কোথায় । এই অনির্বাচিত কন্যাপক্ষের কাছ থেকে অলঙ্কারাদি নেবার প্রসঙ্গই বা কোথায় ?

৩. অনিযুক্তা ভ্রাতৃজায়াং গচ্ছংশ্চান্দ্রায়নং চরেৎ
ত্রিরাত্রান্তে ঘৃতং প্রাশ্য গত্বোদক্যাং বিশুধ্যতি * ।।

নিযুক্ত না হয়ে যে তার ভ্রাতার স্ত্রীর (জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ট) সঙেগ সঙগত হয় , কিংবা যে নিজের ঋতুমতী স্ত্রীর (উদক্যাঃ) সঙেগ রমন করে তার প্রায়শ্চিত্ত এই যে — তাকে তিনরাত্রি উপবাসের পর ঘৃত খেয়ে শুদ্ধ হতে হবে ।

এই ধরণের অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্তের বিধান মনুও অনেক ক'রে গেছেন । নিয়োগ প্রথা নিয়ে কিছু না বলাই ভাল — এই কলঙ্কিত প্রথা বহুকাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে । এখানে প্রায়শ্চিত্ত বিধানের কথাটা বড় নয় ।

আসল কথাটা হচ্ছে পুরুষ ও নারী সম্পর্কে স্মৃতিকারের মনোভাব । যাজ্ঞবল্ক্য আদিম সমাজের উন্নয়নে তৎপর হয়েই এই বিধান করেছেন কিনা বলা মুস্কিল ।

নিয়োগ প্রথার কথা মনে করিয়ে দেয় যে নারী কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র ছিল । মহাভারতের ঐ মহৎ দৃষ্টান্ত কোনক্রমেই অনুসরণীয় নয় । অম্বিকা ও অম্বালিকা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে স্বেচ্ছায় দেহ-দান করেন নি, করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন শ্বশ্রূমাতার আদেশে । তাই তৃতীয়বার ওরা নিজেরা গেলেন না — পাঠালেন শূদ্রাদাসীকে । প্রতিবাদের সামাজিক সাহস নেই , তাই অরুচিকর দেহদানের অমর্যাদার কাছ থেকে আত্মরক্ষার নীরব দুর্বলতা ।

একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামী

গ্রহন করতে হয়েছিল । কিন্তু তার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার বিধান অনুযায়ী দ্রৌপদীকে একাধিক স্বামী গ্রহণ করার জন্য পাঁচ রাত্রি উপবাস করে, বুক জলে ডুবে থেকে প্রাণায়াম করতে হয়নি ।

।।সাত।।

খ্রীস্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকেই যাজ্ঞবল্ক্যের আবির্ভাব । ইনি মনুকেই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু মনুর তুলনায় অনেক বেশী উদার। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব দেখাননি কৌটিল্য (খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ - খ্রীস্টীয় ১০০) উদারতার আদর্শ । তিনি বাল্যবিধবাদের বিবাহ অনুমোদন করেছেন , তিনি অবিবাহিত কুমারীদের কথাও বলেছেন । কৌটিল্য আত্মহত্যার নিন্দা করেছেন । সতীদাহও নিষিদ্ধ করেছেন ।

যাক আমাদের বিবেচ্য শুধু মনু, যাজ্ঞবল্ক্যও পরাশর — 'আনুমানিক খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে পরাশরের আবির্ভাব । তিনটি স্মৃতিকারের নাম করলাম বটে — কিন্তু এরা একসঙ্গেই দীর্ঘকাল ভারতীয় সমাজ পরিচালনা ক'রে এসেছেন । এই সকল ধর্মশাস্ত্রের ধর্মসূত্রগুলি সকলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে ।

আমরা লক্ষ্য করেছি, এদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবু সাধারণভাবে এই কথা বলা চলে — আমরা মনুর শাসনই মেনে চলি। যেখানে যানা অসুবিধে সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যের শরণ নেই। আবার কোথাও বা পরাশরের নির্দেশই মেনে থাকি। যে জীবন আমরা যাপন করি — সেখানকার সংস্কারকর্মে মনুই আমাদের সম্বল। এযুগে আমরা কোন পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করি না। বলতে সঙ্কোচ নেই আমরা সকল ক্ষেত্রেই এখন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করি। এই বিচার বুদ্ধি আমরা পেয়েছি ঊনবিংশ শতকের জাতীয় নব-জাগরণের ফলে। এই স্বাধীন বিচার বোধের নিরিখে আমরা সকলকেই বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চাই — কাউকে অপরাধী ক'রে লাভ নেই — এটি সভ্যতার দান।

"The Smritis, their out look & ideals" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত Venkatrama Sastri লিখেছেন — "To woman is assigned the care of the home. Family being her creation, her association with man in every sphere is stressed. Her unassociated individuality is ignored and she is advised to turn her back on it even to the total suppression of what may be her individual spiritual need."

গৃহজীবনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার নারীকেই দেওয়া হয়েছে, পরিবার তারই সৃষ্টি — এবং প্রতিপদে পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জীবনের যে অংশের সঙ্গে পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই তাকেই তুচ্ছ করা হয়েছে এবং উপদেশ দেওয়া হয়েছে — তার ব্যক্তিগত আত্মিক সত্তা যেখানে উপেক্ষিত সেই অংশে সে অনায়াসে সেখানেই সে বিদ্রোহ করতে পারে।

মনু যাজ্ঞবল্ক্য পড়লে মনে হয় না — নারীকে এই বিদ্রোহের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটি লেখকের স্তোকবাক্য মাত্র — সম্পূর্ণভাবে স্বকল্পিত। প্রকৃতপক্ষে একটি গৃহে অন্যান্য পরিজনের সঙ্গে সে বাস করতে পারে বটে, কিন্তু গৃহের সর্বময় কর্তৃত্ব তার নেই — সেখানে সে দাসীমাত্র।

বৈদিক সভ্যতা থেকেই স্বাভাবিক পথে ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি। বেদে আছে কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির অনুরাগ রঞ্জিত বন্দনা। এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে আছেন সূর্য্য, চন্দ্র, পবন, রাত্রি, উষা প্রভৃতি — বৈদিক মানুষ এদের দেখেছে উপকারী মিত্র হিসেবে — তাই অকুণ্ঠভাবে এদের প্রসন্ন করার চেষ্টা এবং প্রসাদ ভিক্ষার আয়োজন। বৈদিক স্তব মালায় এদের কোমল, মধুর স্নিগ্ধ রূপও যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি অঙ্কিত হয়েছে প্রলয়ঙ্কর রূপও।

আর্যগণ যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তাদের বিরোধী ছিল এক

অনার্য জাতি এবং দক্ষিণের আর একটি জাতি, এদের সভ্যতা ছিল সকল দিক থেকেই পৃথক। আর্যগণ এদের মধ্যেই নিজেদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে মিশে গিয়েছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, বেদ কতকগুলি স্তব মালার সঙ্কলন তাছাড়া এদের ধর্মীয় কিছু অনুষ্ঠানও ছিল। একটা ধর্মীয় পরিবেশ অনুক্ষণ তাদের সকল চিন্তা ও ভাবনাকে ঘিরে ছিল।

এই ধর্মীয় চেতনা থেকে পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য কোন কালেই মুক্ত হতে পারে নি। আর একটি কথাও এইখানেই বলে নেওয়া দরকার। দেবতার বন্দনাগীতি রচনার সময় রচয়িতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি যেমন সজাগ ছিল — অন্যদিকে তেমনি পার্থিব পথে অর্থাৎ স্বাভাবিক ধারায় এরা এদের ভাবনাকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বন্দনাগীতি রচনা করতে গিয়ে তাদের প্রশ্ন জেগেছে — এত বহু দেবতা — আমি কাকে হবি দেব ? '' কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?'' প্রশ্নের সমাধানও তারা পেয়েছেন — ' নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' — বিশ্বে 'নানা' নেই, একজনই, অন্যান্য দেবতা তারই বিভূতি। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল বেদের বহুদেবতাবাদ থেকে (Hedonism) উপনিষদের একেশ্বরবাদ (Monism).

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে বেদে উষা দেবতার একটি স্তুতিবন্দনা আছে। তাতে উষার বর্ণনায় ঋষি

বলেছেন — উষা যেন একটি নর্ত্তকী বালিকা । সুন্দর পরিচ্ছদে ইনি দেহ আবৃত করেছেন — কিন্তু তার বক্ষ দুটি মুক্ত রেখেছেন — মুক্ত রাখার উদ্দেশ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা । মৌর্য্য যুগে এক নর্ত্তকী বালিকার অনুরূপ terracotta মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে । কিন্তু বৈদিকযুগে এই জাতীয় মূর্ত্তি নৃত্য, অভিনয়ও সঙ্গীতের এক সম্মিলিত রূপ ।

ভরত বলেছিলেন নাট্য পরিকল্পনার লক্ষ্য ধর্ম্ম ও যশের বৃদ্ধি । এর লক্ষ্য মানবীয় ঘটনা ও চরিত্রের অনুকরণ ।

কালিদাসের কাব্যে বা নাটকে প্রেম তার আবেগ বিহ্বল মুহূর্ত্তেও ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করেনি । এই সংযম ধর্ম্মীয় মনোভাবেরই একটি অঙ্গ — এবং এই ধর্ম্মীয় মনোভাব উত্তরাধিকার সূত্রেই বৈদিক সাহিত্য থেকে classical সাহিত্যে এসেছে । রসশাস্ত্রে এই মূর্ত্তি আর্টের এক অনবদ্য প্রকাশ হিসেবেই গৃহীত হয়েছে । এই ধর্ম্মীয় মনোভাবই কবি ও শিল্পীদের প্রেরণা দিয়েছে তাদের কাব্য বা নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে । কালি - দাস তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ থেকে। তিনি কুমারসম্ভব কাব্যে উমার দৈহিক সৌন্দর্য্য সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন কিন্তু সেখানেও দেখতে পাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের এক আশ্চর্য সমন্বয় — বলা যেতে পারে ত্রিবর্গ সাধনই যেন কবি ও শিল্পীদের আদর্শ। ভবভূতির মালতীমাধবে বা শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে ধর্ম্ম অর্থ ও কামের মধ্যে প্রত্যক্ষ সমন্বয় কিছু হয়নি তবু চরিত্রগুলি উন্নতস্তরের । দ্বাদশ থেকে অষ্টা - দশ শতক পর্য্যন্ত সমস্ত নাটকই হয় কৃষ্ণ কাহিনী নয়তো রামকাহিনীকে

ভিত্তি করে রচিত । চরিত- নাটক বা চরিত - কাব্যগুলি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য । হিন্দুর চরিত্রে এই আদর্শনিষ্টা দৃঢ়মূল হয়েই ছিল ।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলি একবার সযত্নে অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে দশম শতকের পর সমাজস্থ বিভিন্ন বর্ণের মানুষের কর্মকে একই নিয়মে বাঁধ - বার একটা চেষ্টা হয়েছিল । এই চেষ্টার ফলে মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা এবং মনের সহজ বিকাশ যে বিশেষ পরিমাণে ক্ষুন্ন হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই । মানুষের মনের উপর এই অত্যধিক চাপের ফলে মানুষ মনে করতো নিয়মের পূজাই জীবনের পরম সার্থকতা — জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তারা একটা প্যাটার্নের পূজা করতো । পরবর্তী স্মৃতিকারেরাও যেন এই একই কথাই বলতেন — অতীতের নিয়ম-নিষ্ঠাকেই মেনে চলা , তাতেই জীবনের চরিতার্থতা । স্মৃতির খাঁচায় এইভাবেই অতীতের স্বাধীন ও মুক্ত জীবন বন্দী হয়ে গেল । কালিদাসের মত কবিও এই প্যাটার্নের পূজাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । রঘুবংশে আদর্শ রাজা দীলিপের বর্ণনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । অতীতের প্রতি নিষ্ঠা খুবই প্রশংসার বস্তু কিন্তু স্বাধীন চিন্তাকে বিসর্জন দিয়ে নয় । এই কারণেই রামায়ণ, মহাভারত, শূদ্রক ও ভাসের রচনাবলী তুলনায় অনেক বেশী মানবীয় — পরবর্তী কবিদের রচনা থেকে । সামাজিক জীবনের নিশ্চলতাই এর কারণ । কালিদাস খুবই সতর্ক কবি ছিলেন — তার সময়ে গান্ধর্ব হয়তো অচল হয়ে এসেছিল। — এই জন্যই তার নাটকে (শকুন্তলা) পরে তিনি দৈববানীর সাহায্য নিয়েছিলেন — তাতে বলা হয়েছে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করে কিছু -

মাত্র অন্যায় করেন নি — আসলে শকুন্তলা ক্ষত্রিয়েরই কন্যা — সুতরাং নায়কের বিবাহ যোগ্যা। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি আনুগত্য এই সংস্কার স্মৃতিকারদেরও রচনা প্রভাবিত করেছিল, তাই তাঁরা তাদের বিধানকে শিথিল করতে পারেন নি। মনু যে সদাচার বিধির কথা বলেছেন তা কঠিনতর করার অবশ্যই প্রয়োজন।

আর একটি প্রয়োজনও ছিল। প্রাচীন সভ্যতা ছিল পল্লী কেন্দ্রিক পরে এই সভ্যতাকে নগর কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে — ধীরে ধীরে স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত জীবনের স্বপ্ন লুপ্ত হয়ে যায়। মুক্ত ও বিহ্বল প্রেম যৌন পিপাসাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। এই পিপাসা ব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন কবির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি কবিতায় (Love Lyrics) অমর শতকের বা ভর্তৃহরির খণ্ড কবিতা আমরা স্মরণ করতে পারি। জাতির অবদমিত কামনাই সে সব কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। দ্বাদশ শতকের পর সমাজ চিত্র ছিল পৃথক তখন তপোবন জীবনের সঙ্গে নাগরিক জীবনের পার্থক্য দূরীভূত হয়ে গেছে। এই পার্থক্য কালিদাসের আমলে ছিল — ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকের চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্কে দুষ্মন্তের রাজদরবারে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। যে সময়ের কথা বলতে যাচ্ছি সামাজিক মানুষের অবদমিত যৌন পিপাসার নিবৃত্তি হত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি কবিতায়। কিন্তু সেই পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ।

অথচ সব রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই শৃঙ্গাররস, কাব্যে ও নাটকে এর

গুরুত্ব অসীম। পরবর্তী কালের সাহিত্যে প্রেম ত্রিবর্গের অন্যতম সাধন হিসেবেই স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ প্রেমের দৈহিক দিকটা তুচ্ছ না হলেও মনে করানো হতো তা ধর্মের অঙ্গ। ধর্মের বিধিকে লঙ্ঘন না করলে দেহলিপ্সায় কোন বাধা নেই। সংস্কৃত শতক কাব্যগুলি এই ধরণের শৃঙ্গার রসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্মৃতিশাস্ত্রগুলি অথবা আমাদের নৈতিক সাহিত্য সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য জীবনের প্রতি স্তরে পালনীয় বিধানের নির্দেশ দিয়েছে — এসব বিধান প্রত্যেকটি বর্ণেরই পালনীয় লক্ষ্য, প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্য করণীয়। এই বিধানগুলি শতকের পর শতক ক্রমেই কঠোরতর হয়েছে — সামাজিক শিথিলতাই এর কারণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের চরকসংহিতায় চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে খাদ্য ও পানীয়ের নির্দেশ ছিল পরবর্তীকালে তা সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য হয়েছে। রাজাদের নিয়মগুলি মেনে চলতে হত — কেননা নিয়ম পালনে বিশেষ শ্রেণী বলে কিছু ছিল না।

এই সর্বজনীন ধর্মনীতির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ায় কোন রাজার পক্ষে অত্যাচারী হয়ে ওঠা কঠিন, এতই কঠিন ছিল ধর্মনীতি ও আইন। সাধারণ ভাবে বলা চলে যে সেই আইন ছিল রাজাদের পালনীয়।

মৌর্য্যদের শাসনেই কতকগুলি আইন করা হল, আইনগুলি রাজার পক্ষে সুবিধাজনক, প্রজার পক্ষে নয়। মৌর্য্যেরা শূদ্র। সুতরাং শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। 'ধর্ম্মায় রাজা ভবতি' — ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই

রাজার অস্তিত্ব আত্ম স্বার্থপূরণের জন্য নয় ।

আমরা আগেই বলেছি ধর্ম্মসূত্রের শাসন শতকের পর শতক কঠোরতর হয়ে চলেছে । এই সম্পর্কে বিখ্যাত মনীষী ডক্টর সুশীল কুমার দে লিখেছেন --- '' The stringent grip of the smritis became more and more tightened with the advance of centuries . Restrictions of food and drink and various kinds of conduct and practice became more and mofe stringent signifying there by a slackening tendency in society ."

অর্থাৎ শতাব্দীর পর শতাব্দী অগ্রসর হয়েছে — সঙেগ সঙেগ স্মৃতি - শাস্ত্রের নিয়মের কঠোরতাও বেড়েছে । লেখক বলেছেন — "A slackening tendency in society ;", অর্থাৎ সমাজ জীবনের শিথিলতাই এর কারণ ।

কিন্তু এর দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্গত নারীবিদ্বেষ বা শূদ্রবিদ্বেষ ব্যাখ্যাত হয় না । গীতায় ভগবান বলেছেন —''চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশ: '', সামাজিক মানুষদের গুণ ও কর্মানুসারেই জাতিকে

চারিটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে — এখানে বিভাগের মূল সূত্র — গুণ ও কর্ম। কিন্তু দেখা গেছে চন্ডালের বৃত্তি নিয়েও ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ বলে পূজিত হয়েছে। বেদেও নারী বিদ্বেষ নেই — গুণের গুণে নারীগণ সেখানে সম্মানিত হয়েছে। কিন্তু ঋতুমতী ব্রাহ্মণ কন্যাকে স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এই বিধানের বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই। সেই ভার ভবিষ্যৎ গবেষকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

।। আট ।।

এটি বেশ কৌতুকজনক বলেই মনে হতে পারে যে আধুনিক দৃষ্টিতে বিগর্হিত কতকগুলি ব্যাপার স্মৃতিকারগণের সমর্থন লাভ করেছিল।

ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে বাঙলার স্মৃতিকারগণের মধ্যে অধিকাংশই আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বাদশ শতকের পরে। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথার ফলে সমাজের কুশীলবগণ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এর ফলে একজন কুলীন নন্দন অপদার্থ হলেও একাধিক স্ত্রী নিয়ে সুখে ঘর - সংসার করতেন। বহু বিবাহ এমন ব্যাপক হয়ে পড়েছিল যে স্ত্রীর ভরণ পোষণ বিষয়ে স্বামীর কোন দায়দায়িত্ব ছিল না।

স্মৃতিশাস্ত্রগুলির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল — এতে পত্নীর কোন পৃথক সত্তা স্বীকৃত হয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে পতির সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার কেবল ভোগের — বিক্রয় বা দান করার কোন অধিকার স্বীকৃত হয়নি, শুধু সেবার মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য নিয়ে বড় বড় বক্তৃতা আছে।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে স্মৃতিকারগণের বিধান যা ছিল সেকথা ভাবাই যায় না আজ-কের দিনে। স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকা, অন্যের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো অন্যের গৃহে বাস স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। স্বামী বিদেশে থাকলে তার প্রসাধন করা বলবে না তবে একেবারে বিধবার মত প্রসাধন বর্জিত থাকাও চলবে না। স্মৃতির বিধান অনুযায়ী যৌনাচার জনিত অপরাধে ব্যভিচারিনী স্ত্রীকে স্বামী ত্যাগ করতে পারেন বধও করতে পারেন। কিন্তু ব্যভিচারি স্বামীকে স্ত্রী অনুরূপ ভাবে ত্যাগ বা বধ করতে পারবেন কিনা এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার নীরব। একই অপরাধে দন্ড গ্রহণ করে, স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করলেন, অপর জন মনোমত আর একটি স্ত্রী গ্রহণ করে সুখে গৃহজীবন যাপন করলেন। স্ত্রী মৃত্যুর পর সন্তানের কাছে কোন পিন্ড পাবে না — কেবল তার মৃত্যুর তিথি পালনীয়। পতিই পরম গতি নারীর জীবনে — এই ছিল স্মৃতিনিবন্ধকারদের বিধান।

বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে সোজাসুজি বলেছেন — ''অবতার কৈল আমে তোর রতি আশে'' — অর্থাৎ তোমার

দেহ সম্ভোগ করার জন্যই অবতার রূপে আমার আবির্ভাব ।

ষোড়শ শতকে শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেও বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচলিত ছিল । এই সময়ে তান্ত্রিকেরাও ছিলেন । তান্ত্রিকদের মধ্যে 'কৌলাচারী' —রাই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই কৌলাচারী তান্ত্রিক সম্প্র - দায়ের রীতিনীতি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাঙলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে (৩য় সংস্করণ ২৬৬ পৃঃ) বর্ণনা করেছেন —'' কেহ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত একজনের নিকট দীক্ষা নিতে হয় এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাহার বৃদিধ শ্রাদধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । এবং দিবাভাগে বহুবিধ অনুষ্ঠানের পর ঘোষনা করিতে হয় , সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত ত্যাগ করিল এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ এবং রাত্রিকালে গুরু ও শিষ্য বামাচারী আইন অনুযায়ী আটটি তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক (নর্তকী ও জাতির কন্যা, নাপিতের স্ত্রী বা কন্যা, ব্রাহ্মণীর কন্যা , একজন ভূস্বামীর কন্যা ও গোয়ালিনী সহ) একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একটি স্ত্রীলোক বসে । গুরু তখন শিষ্যকে নিম্নলিখিত রূপ উপদেশ দেন —' আজি হইতে লজ্জা ঘৃণা শুচি , অশুচি জ্ঞান জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে মদ্য, মাংস , স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা ইষ্টদেবতা শিবকে স্মরণ করিবে এবং মদ্যমাংস প্রভৃতি প্রভুপদে লীন হইবার উপাদান স্বরূপ মনে করিবে ।'

বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা করে। প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করাই তাদের চরম লক্ষ্য। সহজিয়া বৈষ্ণব মতে এই পরকীয়া দেহভোগ থেকেই ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়। এই ধরণের সহজিয়া সাহিত্যতত্ত্বের প্রচার সমাজের সর্বস্তরে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসে যে পুরুষ নারীকে ধর্মসাধনের যন্ত্রহিসেবে এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার জন্য নারীদেহভোগ-কাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে চলতো। ফলে স্ত্রীলোকের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এবং তাকে পুরুষ সমাজের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগীয় বিকৃত ধর্ম্ম এইভাবেই নারীর ব্যক্তি-গত সত্তাকে অস্বীকার করেছে।

অপর এক সম্প্রদায় ধর্মঠাকুরের পূজা করতো। ''শূণ্যপুরাণ ও ধর্মপূজা বিধান'' নামক দু'খানি গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। নারী সমাজ ছিল এদেরও নিরংসার বলি।

যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে (অন্য সময়ে তো বটেই) সবদেশে সব কালেই সৈন্যদের দ্বারা নারীজাতির অপমানের সীমা থাকে না। 'মহারিস্তান-ই-প্রায়েরি' নামক সমসাময়িক এক গ্রন্থে মুঘল সৈন্য কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকার নিজেই ছিলেন সেনা-নায়ক — তিনি বর্ণনা লিখেছেন —'' যে তার সৈন্যরা চারহাজার স্ত্রী-লোক বন্দী করে এনে সবাইকে বিবস্ত্র ক'রে রেখেছিল। সেনাপতি সংবাদ পেয়ে যখন তাদের মুক্তি দেবার আদেশ দিলেন তখনও কা:ও

বস্ত্র ছিল না। পাজামা, বিছানার চাদর আলোয়ান প্রভৃতি দ্বারা কোন - মতে লজ্জা নিবারণ করে তাদের ঘরে পাঠানো হল।''

সতীদাহ প্রথা মধ্যযুগীয় নারী নির্যাতনের এক অন্যতম জঘন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ — এর মূলে আছে হিন্দু সমাজের কুসংস্কার। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সকল সংস্কার বদধা রমনী স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতেন — তাদের কথা পৃথক কিন্তু অনিচ্ছুক রমণী-দের সহস্র কাকুতি মিনতি ভয়ার্ত ক্রন্দন প্রভৃতি তুচ্ছ করে মৃতের আত্মীয় স্বজনেরা জোর করেই পুড়িয়ে মারতেন।

আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ''বৃহৎবঙ্গ'' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৬৫৩) লিখেছেন — '' মুসলমান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সিন্ধুফী (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত হিন্দুললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মৈমনসিংহের মঙগলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচকের দেও - য়েনেরা এইরূপ যে কত হিন্দুললনাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই।'' পঞ্চদশ শতকের সাহিত্যেও এমন বহু বর্ণনা আছে।

মধ্যযুগের রাজানুকুল্যে রচিত সাহিত্যে যে সমাজের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করতে পারবেন না এটিই স্বাভাবিক। আসলে দেশ যখন আক্রান্ত হত তখন লুণ্ঠিত রমণীদের বিবস্ত্রা ক'রে তাদের উপর নৃশংস অত্যাচারীর দলে শুধু মোঘলপাঠান, তাতার, তুর্কী, মগ, ফরাসী পর্তুগীজ ইংরেজ দিনেমার

প্রভৃতি দস্যুরাই ছিলেন তা নয়, এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এদেশের ভাগ্য-লিপ্সু পরপদলেহী অজস্র পুরুষও।

একশ্রেণীর তথাকথিত দার্শনিক ও সমাজসচেতন পন্ডিতেরা শাস্ত্রচর্চা ও তত্ত্বব্যাখ্যা নিয়ে যতখানি মত্ত ছিলেন সমাজজীবনের মূল নির্নয়ের দিকে ততখানি আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়না। এই উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ সমাজই মধ্যযুগীয় সমাজজীবনের শাসন ও নিয়ন্ত্রন করতেন। শিক্ষাদীক্ষা ও সাধন ভজনের দ্বারা আত্মিক উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা ছিল তাতে একমাত্র পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল — সমাজের অপর অর্দ্ধাংশের তথা নারীজাতির জীবনে শিক্ষা ও সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়নি — তাই তারা গৃহান্তরালবর্ত্তিনী হয়েই জীবন যাপন করতে বাধ্য ছিল। যে দু-একটি বিরল উদাহরণ তুলে ধ'রে ঐতিহাসিক বা সমালোচক মধ্যযুগের নারী-শিক্ষার সমর্থনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন তাদের আমরা সমর্থন করিনা, সমাজের বৃহত্তর অংশে নারীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিতাই ছিল। শাস্ত্রীয় যে সব বিধান নারীকে স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিয়ে পুণ্য অর্জন করার বা সতী বলে ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি রক্ষার অবাস্তব প্রলোভনে প্রলুব্ধ করেছিল সেই প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারকগণ এ-বিধানের মূল্যহীনতা যুক্তি দিয়ে খন্ডন করেছিলেন। এই সব বিধানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে পরিগণিত করে আইন করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবন্ত নারীকে তার স্বামীর চিতায় নির্মমভাবে দগ্ধ করা যে কত বড় পৈশাচিক অপরাধ তা ব্যাখ্যা করা যায় না।

মোটামুটি এইগুলিকেই মধ্যযুগের নারীজাতির লাঞ্ছনার মূলীভূত কারণ রূপে নির্দেশ করা যেতে পারে — মুসলমান রাজগণের ভোগলিপ্সা, বিজয়ী সৈন্যদের রমণী লুণ্ঠন, নাথধর্ম তান্ত্রিক আচার ও ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং জাতির মজ্জাগত কয়েকটি কুসংস্কার। সবার উপরে সামন্ত শ্রেণীর অত্যাচার তো ছিলই।

মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে রাজকীয় আনুকূল্যে যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে কিছু ইসলামী রোমান্স রাজসভার আনুকূল্যে বাঙলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এই যুগের রাজানুকূল্যে প্রকাশিত সাহিত্যসমূহ স্বাভাবিক কারণেই সমাজের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করতে পারেনি। রাজা ও শাসনকর্তাদের অথবা শাসনকার্যের সঙ্গে নিযুক্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গের অসামাজিক আচরণ আচরণ তথা নারীদেহ লোলুপতার কথা সঙ্গত কারণেই অনুগৃহীত কবিগণ চিত্রিত করতে পারেন নি।

কিন্তু কোন কোন সাহিত্যিক স্বাধীনভাবে সমাজচিত্র এঁকেছেন। কবি বৃন্দাবন দাস সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে' কাজীর আদেশের বিরুদ্ধে চৈতন্যমহাপ্রভুর কণ্ঠে অত্যাচারী কাজীর গৃহ ও গৃহসংলগ্ন বাগান ধ্বংস করার আদেশ ধ্বনিত হয়েছে —

ক্রোধে বলে প্রভু - 'আরে কাজী গেল কোথা'।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা।।

প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার ।
ঘর ভাঙগ ভাঙগ প্রভু বলে বার বার ।।

(চৈতন্যভাগবত মধ্যখন্ড)

কিন্তু কৃষ্ণদাসের ''চৈতন্যচরিতামৃত '' গ্রন্থে এই চিত্র অঙ্কিত হয়নি। কবি ছিলেন গৃহী — সমাজ ও শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া অতিবৃদ্ধকালে তিনি তার গ্রন্থ সমাপ্ত করেছিলেন।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, উচ্চ শ্রেণীর গোষ্ঠীই মধ্যযুগীয় সমাজ জীবনকে শাসন ও নিয়ন্ত্রন করেছেন। যতটুকু শিক্ষাদীক্ষা ও সাধন-ভজনের দ্বারা আত্মিক উন্নয়নের প্রচলন ছিল তাতে একমাত্র পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। এরফলে সমাজের অপর অর্দ্ধাংশ তথা নারীর জীবনে নেমে এসেছে সামগ্রিক বঞ্চনা। নারীকে গৃহান্তরালবর্ত্তিনী হয়েই জীবন যাপন করতে হয়েছে। যে দু'একটি বিরল উদাহরণ তুলে ধরে ঐতিহাসিক বা সমালোচকগণ উল্লসিত হয়ে ওঠেন তাদের উল্লাসে বাধা দেবার কিছু নেই। কিন্তু যে দু'চার জন নারী বেদের সূক্ত রচনা করে বা শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ ক'রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, বৃহত্তর অর্দ্ধাংশের তুলনায় তারা অতি তুচ্ছ। বিদ্যা চিঠি লিখেছিলেন সুন্দরকে — এ সংবাদ আমরা ভারত-চন্দ্রের কাব্য পড়ে জেনেছি। কিন্তু আমরা সে চিঠির মধ্যে পুরুষের ভোগের জন্য নিজ দেহকে উপঢৌকন দেবার আবেদন ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাইনা। সরল সত্য এই, নারীর জীবনবৃত্ত কেবলমাত্র অন্তঃপুরের সাজসজ্জা, রন্ধনাদি প্রকরণ ও পুরুষের ভোগের জন্য নিজদেহের সৌন্দর্য্যচর্চার মধ্যেই

সীমিত ছিল। যে পারিবারিক চিত্র সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে চিত্রিত হয়েছে সেখানে একটা গতানুগতিক বংশবৃদ্ধি ও অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা নারী নির্যাতনের অপর নিদর্শন। বাল্যকালে বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে কন্যার পিতা কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতেন। সে স্বামীর যদি আরও বহু স্ত্রী থাকে তাতে কিছু যায় আসেনা। সেই বৃদ্ধ স্বামী স্বল্পকাল পরে পরলোক গমন করলে সেই বাল্যবিধবাকে সারাটা জীবন এক অপ্রাকৃত আচরণের ভিতর দিয়ে কাটাতে হতো। আসল কথা নারীকে একটা সামাজিক কুপ্রথার বলি হতে হত। এই সব বিধবা মহিলারা কোন সামাজিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেনা। সমগ্র সমাজের একটা তাচ্ছিল্য বা অহেতুক করুণার পাত্রী হয়ে এদের বেঁচে থাকতে হতো যার ব্যতিক্রম এখনও তেমন দেখা যায় না।

।। নয় ।।

ঐহিকবাদী রাষ্ট্রনৈতিক জীবনবাদ ও পারত্রিকবাদী অধ্যাত্মজীবনবাদের দ্বন্দ্বে আবর্তিত মধ্যযুগীয় সমাজজীবন মানবজীবনের সামগ্রিক বিকাশের কোন উচ্চতর চিন্তাধারার ফসল তুলতে পারেনি। যে পারিবারিক জীবন সাহিত্যে

চিত্রিত হয়েছে সেখানে কোন প্রগতির স্পর্শ নেই , কোন প্রাণের স্পন্দন নেই।

মধ্যযুগের শেষভাগে যখন পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহ জ্ঞানে বিজ্ঞানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতিতে উন্নয়নশীলতার দিকে পদক্ষেপ করেছিল তখন এদেশে ষড় - যন্ত্র, ব্যভিচার, দুর্নীতি, শোষনের উন্মত্ততা মানুষের মনকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করে রেখেছিল । বহু শতাব্দীর আক্রমণ, নির্যাতন ও অধিকার স্থাপনের ইতিহাসের ধারা বেয়ে যখন পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল জাতিগুলি এদেশের যুদ্ধ-বাদী শক্তি-সমূহকে নির্মূল ক'রে আপন অধিকার স্থাপনে প্রয়াসী হল তখন সেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা উদার মানসিকতা সম্পন্ন কিছু মানবতাবাদী মনীষীর স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো বাঙালী । বাঙালীর ন্যুব্জ পৃষ্ঠ মানসিকতা যেন নতুন ভাবে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পেল । আমরা উনবিংশ শতকের জাতীয় জীবনে নবজাগরণের প্লাবনের কথা মনে করেই একথা বলছি ।

এটিই প্রকৃতির নিয়ম - ঢেউ এর পরে ঢেউ । সমুদ্রের ঢেউ থেমে থাকে না - সেই স্তিমিত বেগ সঞ্চারিত হয় পরবর্তী তরঙ্গে । তার রূপ আমরা দেখেছি উনবিংশ শতকে — দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্প-কলায়, সংস্কৃতির সমস্ত বিভাগেই সে কি উচ্ছ্বাসে, সে কি প্লাবনের বেগ, সে কি জাগরণের কোলাহল.। মধ্যযুগে ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের প্রভাবে জাতীয় জীবনে একবার জোয়ার জেগেছিল । বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ভিত্তিভূমি রচনা ক'রে দিলেন — গড়ে উঠলো বৈষ্ণব দর্শনে । এছাড়া চরিতসাহিত্যে , রসতত্ত্বে , নাটকে , কাব্যে, অলঙ্কারশাস্ত্রে জাতীয়

ভাবনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কি উন্মাদনা , কি বিপুল উচ্ছ্বাস । সভ্যতা ও সংস্কৃতির এইটুকুই পার্থক্য । সভ্যতা সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে ক্রমশঃ অগ্রগতির পথে চলে — পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা তার পরবর্তী পদক্ষেপের পাথেয় । কিন্তু সংস্কৃতির তরঙ্গ কখন আসে কেউ বলতে পারে না । বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে বা প্রভাবে এই পরিবর্তন আসে জাতীর জীবনে। এই জোয়ার এসেছিল ইটালীতে চতুর্দশ শতকে — তার জের পঞ্চদশ শতক এমনকি ষোড়শ শতক পর্যন্ত চলেছিল । আমাদের দেশে ষোড়শ শতকের পর দুশো বছর বিরাম দিয়ে আবার এসেছিল ঊনবিংশ শতকে — '' সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার ।'' এই জাগরণের ফলে কি ফসল ফলবে তা ভবিষ্যৎই জানে ।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে নব জাগরণের সূচনা হয় তার কালসীমা ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক । এই যুগ প্রভাব সমগ্র ষোড়শ শতক ধরেই বিস্তৃত ছিল।

বাঙালীর সমাজজীবনে এদেশের আর্য্যপূর্ব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত ক'রে আর্যসংস্কৃতির প্রভাব প্রাচীন যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এদেশে পাল ও সেনবংশের শাসনকালে প্রায় চারশো বছর ধরে (৮ম - ১২ শতাব্দী) উত্তর ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতি সমাজের উচ্চতর মহলে শেকড় গেড়ে বসেছিল । সংস্কৃত শাস্ত্র ও পুরাণাদির অনুশাসন বাঙালী সমাজ ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক সেন রাজাদের রাজত্বকালে আত্মস্থ করেছিল । বাঙালীর কাব্যে ও

সাহিত্যে সংস্কৃত পুরানাদির এই প্রভাব রাজনৈতিক অস্থিরতার আড়ালেও বিস্তার লাভ ক'রে বাঙালীর মানসিকতা পূর্ণরূপে আত্মীকৃত হয়েছিল।

পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। সে সময়ে প্রজাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন। সেনরাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করায় বৌদ্ধমতাবলম্বী মানুষেরা সমাজের নিম্নস্তরে পড়ে যায়। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে সমাজের এই সব নিম্নস্তরের মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এইভাবে প্রাথমিক স্তরে ধর্মান্তরিত ও পাঠান সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হয় বাঙলার মুসলমান সমাজ। পরে চেঙ্গিস খাঁ যখন ত্রয়োদশ শতকে এশিয়ার তুর্কী মুসলমানদের রাজ্য এবং বোখরা, সমরখন্দ প্রভৃতি ইসলাম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করেন তখন ঐ অঞ্চলের গৃহহীন পলাতক মানুষেরা দলে দলে এসে ভারতের তুর্কী মুসলমানদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইভাবে পরবর্তী কালে দিল্লীতে তুর্কী রাজবংশের পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক সম্ভ্রান্ত তুর্কী এবং মোঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাঙলাদেশে এসে বাস করতে শুরু করেন। বাঙলায় ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এইভাবে ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে এবং বিস্তার লাভ করে। এই সভ্যতা কোনদিনই হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায় নি।

মধ্যযুগের আলোক স্তম্ভ ষোড়শ শতক। জয়দেব থেকে শুরু করে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর ধ'রে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের

ছদ্মনামে কামের নগ্নরূপ ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব মতের মাধ্যমে সমাজজীবনে প্রচলিত ছিল। সাহিত্য সেই সমাজ জীবনকেই প্রতিফলিত করেছে। বলা বাহুল্য, জনমানসের যথেষ্ট উন্নয়ণ না ঘটলে কামগন্ধহীন পরকীয়া প্রেমের অনুশীলন বিপজ্জনক। সাধারণ মানুষ 'নিকষিত হেমের' অর্থ বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। সুতরাং ধর্মের নামে নারীদেহ ভোগের উৎসব শুরু হল। শ্রীচৈতন্য এর প্রতিবাদ করলেন। তাঁর আদেশে বৈষ্ণব ভগবান ভক্তগনের নারীর সঙ্গে কথাবার্তা নিষিদ্ধ হয়েছিল। প্রভুর ভোজনের জন্য হরিদাস একজন বর্ষিয়সী ভক্তিমতি মহিলার কাছ থেকে কিছু উৎকৃষ্ট চাল চেয়ে এনে ছিলেন — চৈতন্যদেব বলেছিলেন —

হরিদাস কৈল প্রকৃতি সম্ভাষণ
হেরিতে না পারি মুই তাহার বদন।

অপরপক্ষে তিনশত বৎসর ধ'রে মুসলমানের দেবমূর্তি ধ্বংসের ও বিবিধ প্রকার নির্যাতনের যে তান্ডবলীলা বাঙলার বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার কোন প্রতিবাদ না করে নীরবে সহ্য করেছে বাঙালী। বৈষ্ণবের দাস্য ও মাধুর্য্য ভাবের প্রভাব বাঙলার সমাজে এত বেশী ছিল যে তার প্রভাবে বাঙালীর পৌরুষ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের ২৩ অধ্যায়ে কাজীর কীর্তন বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক অসাধারণ পৌরুষ দেখিয়ে তার ভক্তগণকে সংগঠিত ক'রে কাজীর গৃহ আক্রমণের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। সে সময়

অ-বৈষ্ণব নবদ্বীপবাসী কাপুরুষের মত ভেবেছিলেন যে বেদের আজ্ঞালঙ্ঘনকারী নিমাই পণ্ডিতের দর্পচূর্ণ হবে। কিন্তু তা হয়নি। আবার সেই কাপুরুষতা ধর্ম্মের মুখোস নিয়ে বাঙালীর চিত্তকে গ্রাস করেছে। তাই শতবর্ষ পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচনা করে চৈতন্যের সাম্যশান্ত প্রেমের সমাহিত জীবন চিত্র এঁকেছেন। যে দৃঢ় বলিষ্ঠ চরিত্র ভক্তের জীবনে নীতি ভ্রষ্টতাকে ক্ষমা করেনি, যিনি অত্যাচারী যবনকে শাস্তি দেবার জন্য সদলবলে এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন — 'নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন' — বাঙালী সেই বলিষ্ঠ পৌরুষের অনুশীলন করেনি।

মধ্যযুগের মানুষ দৈবনির্ভর ছিলেন। পারিবারিক জীবনের নিয়ন্তা কোন অর্থনীতি নয়, ব্যক্তিগত মানসিক সম্পর্ক নয় — নিয়ন্তা কতকগুলি নীতিবাদী সিদ্ধান্ত। তাই পুরুষের জীবনে কোথাও হয়তো তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ দেখা যায়, নারীর ক্ষেত্রে সেটি প্রায় দুর্লক্ষ্য। পুরুষের দেওয়া জীবন বৃত্তের মধ্যেই নারী জীবনের সার্থকতা ও সমাজ জীবনের শৃঙ্খলা নির্ভরশীল — এটাই লক্ষ্য করা যায় মধ্যযুগের সাহিত্যের পাতায় পাতায়। সমাজে নারীর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল একথা বলা কঠিন।

এই সময়ে বাঙলাদেশের ইতিহাস অত্যাচার, অরাজকতা, রিক্ততা, হাহাকার ও বীভৎসতার ইতিহাস। বাঙলার শাসনভার ছিল মুসলমানের হাতে, শাসনের নামে চলছিল একটানা শোষণ। আর একটা কথাও

মনে রাখতে হবে, মুসলমান আক্রমনকারীরা তাদের সঙ্গে কৃষক নিয়ে আসেন-নি — তাদের পক্ষে চাষবাস করা সম্ভবও ছিল না। চাষ করার, ফসল তোলার ভার ছিল হিন্দু জমিদার ও হিন্দুকৃষকদের উপরে। কিন্তু চাষীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। জমি সংক্রান্ত আইন প্রায় আগের মতই ছিল — তাই চাষীদের অত্যন্ত দুঃসহ জীবন যাপন করতে হত।

এই সময়ের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সমালোচক শঙ্করী প্রসাদ বসুর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য — '' একদিকে নবাবী আমলের সন্ধ্যা আসন্ন আর একদিকে কুশলী ইংরেজ বণিকের কৌশল বিস্তার''। বাৎস্যায়ন মধ্য-যুগের সতীসাধ্বী স্ত্রীর একটি চিত্র এঁকেছেন সেটি এখানে উল্লেখযোগ্য।

সতী স্ত্রী বলতে আমরা তাকেই বুঝি যিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অনুমোদিত গুণ সমূহের পূর্ণমূর্তি এবং তিনি বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। তিনি হবেন নানা বিষয়ে পুরুষের সঙ্গী এবং মন্ত্রনাদাত্রী। প্রকৃতপক্ষে তিনি গৃহের আত্মস্বরূপ — এক কথায় পুরুষের জীবনেরই প্রতিরূপ। খাবার টেবিলের ভোজ্যসমূহের তিনিই তদারক করবেন, ধর্মীয় যজ্ঞসমূহের তিনিই হবেন সঙ্গিনী — অবশ্য প্রতিটি ব্যাপারেই তাকে পতির অনুমতি নিতে হবে। পতির অনুমতি নিয়ে তিনি বিভিন্ন ক্রীড়াতেও যোগদান করতে পারেন। অসতী রমণীদের সঙ্গে বার্তালাপ করবেন না। তিনি সমৃদ্ধিতে উদ্ধত হবেন না। কাউকে কিছু দান করতে হলেও তাকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসবেন না।

স্বামী যখন বিদেশে থাকবেন তখন তাকে তপস্বিনীর সংযত জীবন যাপন করতে হবে। এবং তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে সময় কাটাতে হবে। উৎসব বা বিপদের মুহূর্ত ছাড়া তিনি বাইরে কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। এই সময়ে তার অঙ্গে থাকবে ভারগম্ভীর পরিচ্ছদ।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে বাৎস্যায়ন অনেক কথাই বলেছেন — উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার কামশাস্ত্রে যে কয় শ্রেণীর রমণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে — তারা তো পুরুষের রমণের সঙ্গিনী। এই যজ্ঞ পরায়ণা সতী স্ত্রীর চিত্র বাৎস্যায়ন পেলেন কোথায় বোঝা গেল না। স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্গেও তো মেলে না। স্মৃতিশাস্ত্রে তো নারীর পৃথক কোন সত্তা স্বীকৃত হয়নি — সে শুধু পতির ভোগের পাত্রী।

।। দশ ।।

আসলে পাঠান আমলে সামন্ততান্ত্রিক শাসনের ফলে কৃষিজীবীগণ যে অশেষ দুঃখ ভোগ করেছিলেন তার মূল কারণ তাদের দারিদ্র, মূর্খতা ও দাসত্ব। এই সবই অবশ্য অর্থনৈতিক বিন্যাসের ফল। আমাদের ধর্ম-শাস্ত্রগুলিকেও এইজন্য দায়ী করতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা সঙ্ঘবদ্ধ অভ্যুত্থানের কথা বলা সে যুগে সম্ভব ছিল না। তবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর

প্রবন্ধে একটি তাৎপর্য্যময় ইঙ্গিত করেছেন । তিনি বলেছেন —'' বিরোধে উভয় পক্ষেরই উন্নতি'' , এই বিরোধ সমাজ ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্ত্তন ঘটায় । এখানে লেখক সেই শ্রেণী সংঘাতেরই ইঙ্গিত করেছেন ।

প্রজা বলশালী হলে তারা অকর্মন্য রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় । এতে যে শুধু শাসন ব্যবস্থা ভাল হয় তা নয় , মানসিক গুনরাজিরও বিকাশ ঘটে । তুলনা স্বরূপ রোমের প্লিবিয়াণগণ ও ইংলন্ডের কমন্সগণের কথা উল্লেখ করা যায় ।

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেণী সংঘাতের ইঙ্গিত করেছেন মাত্র — কিন্তু তখন পর্যন্ত এই তত্ত্ব প্রচারের অনুকূল সময় আসেনি সুতরাং যারা দুঃখী তারা সারাজীবন শুধু দুঃখই ভোগ করে গেছে ।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের যে দুরবস্থার বর্ণনা করেছেন , আধুনিক জীবনের মানসিকতায় আমরা তার সমাধান খুঁজে পেয়েছি । এখন সে জমিদারের দিনও নেই , কৃষকদেরও সেই দুরবস্থা অনেক দূরীভূত হয়েছে । যারা কুলীন তাদের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সান্ত্বনার বানী উচ্চারণ করেছেন । ''ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে , সদ্যই অধিবেদন করিবে । আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে , যাঁহার ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের গৌরববর্দ্ধনার্থ, সদ্যই পুনর্বার বিবাহ করুণ । স্ত্রীলোক স্বভাবত: মুখরা , দ্বিতীয়া ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,-

- তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবে, তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙালীর মেয়ের মুখ ভালো নহে), তবে আবার বিবাহ করিবে — এরূপ লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিনী শ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন। এমন বাঙালীই নাই, যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে 'মুখ ঝামটা' খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্ত সংখ্যক গৃহিনীকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।''

এই সমস্ত উক্তি অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাসের উক্তি। কিন্তু যে বঙ্কিমচন্দ্র কুলীন পুরুষের সম্পর্কে এই বহু বিবাহের আশ্বাস বাণী শোনাতে পেরেছেন তিনিও নিগৃহীতা নারীজাতীর প্রতি কোন আশ্বাস - বাণী শোনাতে পারেন নি। তবে তাঁর এই বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ শিক্ষিত সমাজে কৌলীন্য প্রথার নবমূল্যায়নের চিন্তার বীজ বপন করেছিল এ কথা স্বীকার করতে হয়।